মাতাল

(সত্যমূলক উপন্যাস)



শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু, এম্, এ, বি, এল

প্রণীত



"He shall call but none shall hear him,
When dark ocean surges
None with saving hand shall hear him
When his prayer he urges.
Laughs the God, to see him vainly
Grasping at the crested rock :
Fool who boasted once profanely
Firm to stand in fortune's shock.
Who so great had been
His freighted wealth with fearful crashing
On the rock of justice dashing
Dies unwept, unseen."

Aeschylus the Euminides.

প্রকাশক—
শ্রীঅবনীন্দ্র কৃষ্ণ বসু
শশীভূষণ লাইব্রেরী
২৭।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র।
কাত্যায়নী প্রেস,
১৮নং ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

মুখবন্ধ

ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে কোনও শিক্ষাই শিক্ষা নামের উপযুক্ত নয়, যে শিক্ষায় চরিত্র গঠিত হয় না সে শিক্ষায় জীবনে বড় বেশী লাভ হয় না, এই তথ্যটী পরিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যে, এই ক্ষুদ্র কাহিনীটী প্রণীত। ইহার মূল ঘটনাটী সত্য, অবশ্য নাম ধাম বদলাইয়াছি, আর অবাস্তব কথাগুলির জন্য কল্পনার সাহায্য লইয়াছি। ধর্ম্মহীনতা ও অসংযমের দ্বারা সংসারে কত অনিষ্ট হইতে পারে, এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা পাঠে যদি কাহারও মনে সে ধারণা হয় তাহা হইলেই শ্রম সফল মনে করিব। ইতি

রাঁচি
ভাদ্র, ১৩২৬

গ্রন্থকার।

মাতাল





১

ইন্দ্রনাথের কথা

প্রিয়ার আমার সবই ভাল—কেবল তিনি যখন জোর করিয়া বলেন—"না গো, তাই কি কখনও হয়, লেখা পড়া শিখে কি কেউ খারাপ হ'তে পারে?" তখনই আমার সঙ্গে তাঁর মতের বিলক্ষণ গর্মিল হইয়া যায়। কেন জান? ঐ কথা বলিলেই শুধু যে নিজের কথা মনে পড়ে তা নয়,—একটা ব্যর্থ জীবনের ব্যথিত স্মৃতিও মনকে আন্দোলিত করে। আমিও তো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ্‌মারা লোক, আমি কি ভাল হইতে পারিয়াছি? অথবা সেই হতভাগা, যাহার স্মৃতি আসিয়া কষ্ট দেয় সেই ভাল হইতে পারিয়াছিল? এ কথা বলিলেই আমি আমার স্ত্রীকে বলি—"ন ধর্ম্মশাস্ত্রং পঠতীতি কারণম্' ইত্যাদি, লেখাপড়া শেখার সঙ্গে চরিত্রসংশোধনের কোনও সম্পর্ক নাই, যে লেখাপড়ায় তাহা হইতে পারিত সে লেখাপড়া এখন নাই।" একদিন তাহাকে কোনও রকমে বুঝাইতে না পারিয়া বলিলাম "তবে একটা গল্প শুনিবে? এ তোমার উপন্যাস নয়, এ সত্য ঘটনা—ভাল লাগিবে কি না জানিনা—তবে তোমার শুনাই ভাল—[illegible] পড়া শিখেও মানুষ কতদূর অধঃপাতে যাইতে পারে তাহাই এ গল্পে [illegible] বে কি? সে বলিল "হাঁ শুনিব, বলনা,"—অনুমতি [illegible] বলিতে লাগিলাম।

"সতীশ আর আমি সহপাঠী ছিলাম। সতীশ ছিল ভালছেলে আর আমি ছিলাম মোটামুটি রকমের ছাত্র। লেখাপড়ায় তাহার তীক্ষ্ণ মেধা, পরীক্ষায় পাশ হইবার জন্য তাহার বুদ্ধি ছিল,—খুব প্রখর। এক দিকে যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অপর দিকে তেমনি ধৃষ্টতা, তেমনি সরসহৃদয়। কাজেই সতীশ বাসার সরদারের পদ অনায়াসে দখল করিয়া বসিয়াছিল। বাসায় কাহারও কোনও অসুবিধা হইলে সে সতীশের কাছে গিয়া বলিয়া দিত, আর সতীশ যেমন করিয়া পারে সেই অসুবিধা দূর করিত। ইহাতেও তাহার সম্মানের বৃদ্ধি হইয়াছিল যথেষ্ট। সতীশ ব্রাহ্মণ-সন্তান, কিন্তু ব্রাহ্মণসন্তানের নিত্যকর্ত্তব্য সন্ধ্যাবন্দনাদি কখনও করিত না; অনেক ব্রাহ্মণ সন্তানইতো আজকাল তাহা করে না, তার জন্য তাহার প্রতি শ্রদ্ধার অভাব আমরা কখনও অনুভব করি নাই। আমরা সভ্য লোক, সাহেব প্রফেসারের কাছে পড়ি, বিজ্ঞান শিখিতেছি, তবে ও সব কুসংস্কার নাই বা মানিলাম? অতএব সে দিকে আমাদের দৃষ্টিই ছিল না। আমরা মনে মনে ঠিক করিয়াছিলাম যে সতীশ একটা তোখড় ছেলে। সতীশ কাহারও তোয়াক্কা রাখিত না, কাহাকেও ভয় বা সমীহ করিত না, যখন যা মনে আসে তাহাই করিত, আমরা ভাবিতাম এই বুঝি শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল। আমরা মেড়া-মারার দল, কোনও রকমে ঘসিয়া মাজিয়া তরিয়া যাইতেছি, আর সে অত দুষ্টামি করিয়াও একজামিনসমুদ্রটাকে গোষ্পদের মত পার হইয়া যাইতে লাগিল, তবে আর আমাদের তাহার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়িবে না কেন? এইরূপে আমাদের শিক্ষা গড়াইতে লাগিল। এখন জীবন-মধ্যাহ্নে কেবলই মনে হয় যে আমরা এই শিক্ষাব্যপদেশে সকল মূলধনই খোয়াইয়া সঞ্চয় করিয়াছি—অসংযম চিত্তবৃত্তির খামখেয়ালি। তাই কবির ভাষায় বলিতে হইতেছে—

"আমায় ছজনায় মিলে পথ দেখায় বলে
পদে পদে পথ ভুলি হে।"

কিন্তু তখন তা মনে হইত না। তখন সেলি বায়রণের কবিতা, সেক্ষপীয়রের নাটক পড়িয়া আনন্দে প্রাণ অধীর হইত, এখনও হয়, কিন্তু তখন যে ভাবে হইত এখন তাহা হয় না, কারণ এখন একটা মস্ত পাথর বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে—তাহার নাম সংসার। তখন যেন সর্ব্বদাই বুকের উপর দিয়া একটা মলয়ের হাওয়া তর্ তর্ করিয়া বহিয়া যাইত, চাঁদের আলোর ভিতর হইতে একটা ঘনীভূত আনন্দের স্রোত নামিয়া আসিয়া জীবনটাকে বন্ধনহীন করিয়া দিত। মনে হইত, জগতে আনন্দই সর্ব্বস্ব ও সর্ব্বত্র, এ আনন্দকে সংযত করিব কেন? প্রাণ যখন উধাও হইতে চাহিতেছে, তখন তাহাকে বাঁধিবার চেষ্টা করিব কেন? জীবনে যে সঙ্গীতের হিল্লোল উঠিয়াছে তাহাকে থামাইব কেন? পঠদ্দশায় নিশ্চিন্ত চিত্তে কত সুখের কল্পনাই উঠিত, সমস্ত জগৎটাকে সোণার চক্ষে দেখিতে তখন কিছুই বাধিত না,—কল্পনা-রঞ্জিত স্বপ্নের ঘোরে সর্ব্বতোভাবে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলাম, সংসার কি বস্তু তখন তাহা জানিবার অবকাশ হয় নাই। এই কবিতা ও গানের মধ্য দিয়া জীবনটা উচ্ছৃখলতার দিকে অবাধে ছুটিয়া যাইতেছিল তাহা বুঝিতেও পারি নাই; মনে ভাবিতাম জীবনের সার, কবিতা ও গান, তাই লইয়াই জীবন বেশ কাটিয়া যাইবে। নবোদ্ভিন্ন বাসনার আবেশে দিবারাত্র "প্রিয়ামুখোচ্ছ্বাসবিকম্পিতংমধু"র স্বপ্ন দেখিতাম। এ সকল বাসনা যে সংযত করিতে হয় তাহা মনেও ভাবিতাম না। তুখোড় ছেলে সতীশ যে "Wine, woman mirth and laughter" এর বিষটা অবাধে গলাধঃকরণ করিতেছিল, তাহা আমরা তখন ভাল বুঝিতে পারি নাই, পরে বুঝিলাম। তাহারজী নের

"Sermon and Soda water" এর জন্য day after আর যে কখনও আসিবে না তাহা বুঝিতে পারি নাই।

ক্রমে সতীশ বি এল্ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগের প্রথম স্থান অধিকার করিয়া, হাকিমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাকিম (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট) হইয়া গেল। আমরাও টায়ে টোয়ে পাস্টাস্ করিয়া—সংসারে প্রবেশ করিলাম। সুখময় কলেজ জীবন শেষ করিয়া সংসারের ফাঁদে পা দিলাম। কেন দিলাম—এবং তাহাতে কি ফল ফলিল সে কথা বলিবার দিন আজ নহে, আজ সতীশের কথাই বলিব।

কেন জানিনা, সতীশ প্রমুখ ধুরন্ধরেরা আমার কাছে তাহাদের ভৈরবী-চক্রের লীলাখেলা লুকাইত। যদি তাহারা আমাকে তাহাদের বড্ড জুনিয়র ঠাওরাইয়া থাকে তাহা হইলে তাহারা ভুল বুঝিয়াছিল। মদ যে খালি তরল দ্রববিশেষ তাহা নহে; অন্য রকম মদও আছে—আমারও "অনাসবাখ্যং করণং মদস্য" যৌবন আসিয়াছিল, আমিও তাহাদেরই মত মানসিক অশিষ্টতায় পরিপুষ্ট হইতেছিলাম, তাহাদেরই মত কবিতাচর্চ্চা ও কবিত্বের মোহে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। জীবনে আনন্দের দাবী ছাড়া তখনও আর কোনও দাবী গ্রাহ্য করিতে শিখি নাই। যাহাই হউক এটা আমার সৌভাগ্য (কি দুর্ভাগ্য ?) যে তাহারা আমাকে তাহাদের দলে লয় নাই। কোনও একটা জাঁকালো রকম কিছু করা আমার জীবনে তাই বোধ হয় হইয়া উঠিল না। চূড়ান্তরকম উচ্ছন্ন যাওয়া সেও বোধ হয় মন্দ নয়। সয়তান বলিয়াছিল,—"বরং নরকের মেট হওয়া ভাল, তবু স্বর্গের দ্বিতীয় ব্যক্তি হওয়া ভাল নয়।" স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন যে "যা করবে তা চূড়ান্তরকম কর, হয় খুব ভাল হও, না হয় খুব বদমাস্ হও, মাঝামাঝি থেক না।" আমরা ঐ মাঝামাঝির দল, কাজেই সতীশের দলে ভিড়িতে পারি নাই, ও তাহারা

আমাকে নিতান্ত না-লায়েক ভাবিয়া তাহাদের কীর্ত্তিকলাপ আমাকে জানিতে দিত না। বরং ঠিক উল্টাটাই আমার কাছে প্রতিপন্ন করিত, একথা আমার বেশ মনে আছে। তাহারা আমাকে ভুল বুঝিয়াছিল, যথার্থই আমি যে তাহাদের অপেক্ষা কোনও অংশে ভাল ছিলাম তাহা নহে, তবে যে মদ খাই নাই বা অন্য উপসর্গ জোটে নাই তাহা কেবল Accident (ঘটনাচক্র) মাত্র। আমার চিত্তও যথেষ্ট পরিমাণে নিরীশ্বর ও ভোগপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সে যেমনই হউক, আজ পর্য্যন্ত আমার হৃদয়ে সেই পঠদ্দশার নিরঙ্কুশ আনন্দের স্মৃতি একটা স্বর্ণসূত্রের মত গাঁথা আছে। একটা স্মৃতির কথা এখানে বলিব— কথাটা বড় জোরে আজ মনে আসিতেছে। আমরা যখন কলেজের পড়া প্রায় শেষ করিয়া আনিতেছিলাম তখন আমরা একটা ক্লাব্ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম ও তাহাকে আমরা হমড্রমক্লাব (গোলমেলে সমিতি) নাম দিয়াছিলাম। সেই ক্লাবে (গোষ্ঠীতে) সমবেত হইয়া আমরা কাব্যচর্চ্চা, সঙ্গীতচর্চ্চা এবং অধিকাংশ সময়ই উদরচর্চ্চাও করিতাম। কেহ কেহ বা স্বলিখিত কবিতা বা ক্ষুদ্র প্রবন্ধও পাঠ করিত। যে সকল পুস্তক পঠিত হইত তাহাদের মধ্যে একটী পুস্তকের কথা এখন বেশ মনে পড়িতেছে। আমরা এক এক জন কোনও একটা নাটকের এক একটা ভূমিকা লইয়া অভিনয় করিতাম ; অভিনয় বলিয়াই যে দৃশ্যপট খাটাইয়া অভিনয় তাহা নহে, একস্থলে বসিয়া ভূমিকাগুলি অভিনয়োপযোগী ধাঁজে পাঠ করিয়া যাইতাম। মহাকবি গিরীশচন্দ্রের "প্রফুল্ল" নাটক আমাদের খুব প্রিয় ছিল, প্রায়ই এই পুস্তক আমরা পাঠার্থ বাছিয়া লইতাম। এই গ্রন্থের "যোগেশ"-চরিত্র আমাদের প্রাণে বড় আঘাত করিত, ইহার Grim tragedy আমাকে বড় আকর্ষণ করিত। আমি তখনই মাতাল দেখিয়াছিলাম অনেক রকম, কেহ নিরীহ, অল্প অল্প মদ

খায়, আত্মহারা হয় না, কেহ বা বোতল সাবাড় করিয়াও অটল থাকে, কেহ বা অল্প মদ পেটে পড়িলেই বক্কার হয়—কেহ বেরাল ডাকে, কুকুর ডাকে, অত্যাচার করে না; কেহ বা আবার মদ খাইলেই অত্যাচার আরম্ভ করে, পরের মাথায় দইয়ের হাঁড়ী ভাঙ্গে; কেহ বা মদ খাইয়া স্ত্রীকে মারে, অথচ মদের মুখেই অনর্গল সেক্ষপীয়র আওড়ায়, আবার আফিসের কাজকর্ম্ম ও সংসারও বেশ করিয়া যায়। মদে যে এত সর্ব্বনাশ হইতে পারে তাহা ঐ যোগেশের চরিত্র পড়িয়া বুঝিয়াছিলাম, কারণ আমরা জানিতাম যে গিরীশচন্দ্র মনুষ্য-হৃদয়জ্ঞ। যখন ঐ স্থানটা পড়িতাম যেখানে যোগেশ আসিয়া বলিতেছে "আমার সাজান বাগান শুখিয়ে গেল," তখন হৃদয়ে একটা অব্যক্ত আশঙ্কা ও বেদনার সৃষ্টি হইত, তবু তখন পর্য্যন্ত মদে অমন সর্ব্বনাশ হওয়ার জীবন্ত চিত্র কখনও চক্ষে পড়ে নাই। পরে যখন সতীশের বিবরণ শুনিলাম, যখন তাহার শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদ পাইলাম তখন হঠাৎ মনে যোগেশের চরিত্রের অকাট্য সত্যতার ছবি মুদ্রিত হইয়া গেল। সতীশের সাজান বাগান তো ভাঙ্গিয়া গেলই—সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনটাই ঐ কুঅভ্যাসের বহ্নিতে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। কিন্তু সে কথা আমি আমার ভাষায় না বলিয়া সতীশের নিজের কথাতে বলিব। তাহার হতভাগ্য জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে সে তাহার অধঃপতনের কথা—নিজে লিখিয়া গিয়াছিল, তাহা তাহার মৃত্যুর পর আমাদের হস্তগত হইয়াছিল, সেই বিবরণই আমি তোমাকে শুনাইব, নিজের কথা নাই বা বলিলাম।

ঐ বিবরণ ভিন্ন আরও উপকরণ যাহা সংগৃহীত হইয়াছে তাহাও এই সঙ্গে তোমাকে শুনাইয়া যাই তাহা হইলেই সতীশের সমগ্র জীবনের চিত্র তোমার কাছে বেশ ফুটিয়া উঠিবে।

জগতে আজকাল নাকি নীতির পরিবর্ত্তে Aristocracy of intellect (বুদ্ধিজীবীর) প্রয়োজন হইয়াছে। বুদ্ধির আভিজাত্য খুব ভাল, কিন্তু আমরা এইরূপ আভিজাত্য-ভুক্ত অনেককে জানি যাহারা ঐ নীতিটুকুকে বর্জ্জন করিয়া শুধু নিজের নয়, সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকের সর্ব্বনাশ করিয়া বসিয়াছে। সতীশের জীবনটাও অনেকটা ঐ ধরণের। তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির কোনও অভাব ছিল না; কিন্তু ঘটনাচক্রে সে তীক্ষ্ণবুদ্ধি কোথায় ভাসিয়া গেল। তাই ভাবি যে কেবল রাশ ছাড়িয়া দেওয়াই কি ভাল? একটু রাশ টানিয়া না রাখিলে প্রবৃত্তি-অশ্বী যে কোথায় লইয়া গিয়া ফেলিবে তাহার ঠিকানা কি? আমাদের যখন রাশ টানিবার সময় তখনই তাহার উল্টা করিলাম; বিদ্যাশিক্ষাটা কাজেই আমাদের পক্ষে ভূতের বোঝা বওয়াতেই শেষ হইল। ইহাতে না হইল নিজের কাজ, না হইল জগতের কোনও কাজ। স্বার্থ লইয়াই পাগল হইলাম, পরের মুখ চাহিতে শিখিলাম না; বিদ্যার গৌরবে আত্মগরিমায় ভরিয়া গেলাম, শিখিলাম না কেবল, ধর্ম্মের গুরুত্ব, অমৃতের সন্তান আমরা—হইলাম নরকের কীট; জগতের যথার্থ সৌন্দর্য্য ভুলিয়া ইন্দ্রিয়সুখের উপাদানকে সুন্দর বলিয়া তুলিয়া লইলাম। বিদ্যা শিখিলাম পেটের ধান্ধায়, তাতে প্রাণও ভরিল না, পেটতো ভরিলই না। একথা তো তুমি জান, তবে জানিয়া শুনিয়াও বল কেন যে লেখাপড়া শিখিলেই মানুষ হয়, নইলে হয় না।

এখন সতীশের কথাটা শোন, সতীশের স্ত্রী সুহাসিনীর লিখিত বিবরণও শোন, শুনিয়া তারপর তোমার মতামত প্রকাশ করিও; আমি মুখ বুজিয়া তাহা শুনিব।

———•———

২

সতীশের কথা

ছেলেখেলা সাঙ্গ করিয়া যে দিন আমি সংসারে প্রবিষ্ট হইলাম, সেদিনকার কত আনন্দ আজও আমার মনে জাগিতেছে। পঠদ্দশায় যেরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছি তাহাতে আমি না হইতে পারি কি? পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমি ডেপুটী হইয়াছি, আর বাকী কি রহিল? এমন অবস্থায় আমার পিতৃদেব ব্রাহ্মণ-সন্তানের নির্লোভিত্ব ভুলিয়া যে একটা দাঁও কসিবেন তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? আর আজকালকার বাঙ্গালীর সংসারের মহাপরাধী ও মহাপাতকী জীব কন্যার পিতা—সে যে আমা হেন গুণবান জামাতা-লাভরূপ মহামঙ্গল সাধনের জন্য নিজের সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াও আমার পদে কন্যা সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইবে তাহাতেই বা বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? আহা! বেচারার মনে কত আশা, কত উৎসাহ! চিরদিন স্নেহে লালিতা কন্যার আজ একটা বড় সুন্দর গতি হইল, তাহার আর জীবনে কোনও কষ্টই রহিল না, এইটুকু দেখিবার জন্য সে না করিতে পারে কি? কিন্তু অত শত দেখিবার বা ভাবিবার আমাদের অবসর থাকে কৈ? সে দিন তো মনে মনে কেবল একটা অজানা ভাবের হিল্লোলই অনুভব করিতেছিলাম। যখন কলেজে পড়িতাম তখন মনে মনে স্বাধীন প্রণয়ের স্বপ্ন যখন তখন দেখিয়াছি, মনে করিতাম স্বাধীন প্রণয়ের সাহায্যে কন্যা গ্রহণ না করিতে পারিলে বিবাহ বিবাহই নয়। কিন্তু কৈ তাতো কাজে ফলিল না; তবুও সেই দিনে মনের মধ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল বৈ কি! আমি মানুষ হইয়াছি, আমার

আবার বিবাহে নিরানন্দ কেন হইবে? তা যাহারা মানুষ না হইয়াই বিবাহ করে তারাই কি সে দিনটায় বড়ই ভাবিত হইয়া পড়ে? বোধ হয় না, অন্ততঃ কাহাকেও তো হইতে দেখি নাই, শুনিও নাই। আজকাল অনেকেই নিজের অবস্থার ও ভবিষ্যতের দিকে দেখিয়া একেবারেই বিবাহ করেন না, তা দেখিতে পাওয়া যায় বটে। বেশী কথায় আর কাজ নাই, গোধূলিলগ্নে বর সাজিয়া বিবাহ করিতে চলিলাম। মা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা কি আনিতে যাইতেছ?" তাহার উত্তরে "তোমার দাসী আনিতে যাইতেছি," এ কথাটা বলিতে মনে মনে বাধিয়াছিল কি? না তাতো মনে পড়ে না; বরং সে সময় একথাটা বড় উৎসাহের সহিতই বলিয়াছিলাম। যতই বিলাতী ছাঁচে ঢালা মন হউক, মাকে চিরদিন ইষ্টদেবীই ভাবিয়াছি, এখনও ভাবিতাম; এ সংসারে যেই নূতন আসুক, সে আমার যত আদরের ধনই হউক আর যেই হউক, মা'র সে দাসী, অতএব মনে কোনও দ্বিধা হয় নাই। যাক্ এখন বর ও বরযাত্র, বরকর্ত্তা সকলে কন্যার আলয়ে উপস্থিত হওয়া গেল।

এ বিবাহ জাঁকজমকের নয়; তথাপি গৃহস্থ ঘরে যে সব আয়োজন হইতে পারে ও হওয়া উচিত তাহা সবই হইয়াছিল। আমার জীবনে যে একটা দায়িত্ব উপস্থিত হইতেছে তাহা সে দিন অন্ততঃ বুঝিবার অবকাশ হয় নাই। সম্প্রদান হইবার পর স্ত্রী-আচার প্রভৃতি শেষ করিয়া যখন বাসর ঘরে প্রবেশ করিলাম, তখন সমস্ত স্ত্রীমণ্ডলীর মুখে চখে যে আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখিতে লাগিলাম তাহাতে সে সময় অন্য কোনও চিন্তার অবসর ছিল না, অন্ততঃ সে সময়টা যেন মনে একটা প্রবল আনন্দের ঢেউ খেলিয়া যাইতেছিল, তাহা অস্বীকার করি কেমন করিয়া? বাঙ্গালীর গৃহস্থ কন্যা ও বধূদের এই একটা অবাধ

আনন্দের দিন, সেই আনন্দতরঙ্গে পড়িয়া আমারও মনে একটা উত্তেজনা আসিয়াছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছিলাম। হায়! যদি সেই দিনের অগাধ আনন্দকে জীবনের কেন্দ্রে স্থায়ী করিতে পারিতাম, তাহা হইলে কত সুখের হইত! আনন্দে আহ্লাদে রসিকতায় গানে যে সময় সকলে বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল, আমারও মনে যখন সেই আনন্দের কলরব একটা কোলাহল সৃষ্টি করিবার উপক্রম করিতেছিল, ঠিক সেই সময়েই শরীরে একটা অবসাদ বোধ হইতে লাগিল; মনে যেন ক্লান্তি উপস্থিত হইতে লাগিল। আজ সন্ধ্যার কালে বহুদিন যাবৎ যে গুরুজনের কাছে লুক্কায়িত অভ্যাস করিয়া আসিয়াছি তাহা হয় নাই—মদ খাওয়া হয় নাই; নেশা করা হয় নাই। তামাক চাহিয়া খাওয়া যায়, মদ তো চাহিবার যো নাই, কি করি? যখন প্রাণের তার বেসুরা বোধ হইতেছিল, তখন সেই আমোদের বাসরে গান হইতেছিল,—

"জীবনে মরণে তোমারি চরণে
বাঁধা রবে তব নব সহচরী,
মঞ্জু প্রেমভাষে স্নিগ্ধ মধুহাসে
ফুল্ল করো সদা হৃদয় তাহারি।
মৃদুল লতিকা তব হৃদয় ঘিরি
হবে নব মুকুলিত ধীরি ধীরি,
ঢালিবে গরবে সরমে নীরবে,
বাসনা লহরী হৃদয়ে তোমারি;
বাজায় বাঁশরী চির-প্রেম-ভরা
তাহার লাগিয়ে ক'রো মধুর ধরা—
এ মধু নিশীথে হাসিতে হাসিতে দোঁহে হও
দুজনার হৃদয়বিহারী।"

হঠাৎ মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিল, আমি কি পারিব ? এই মধুর কোমল হৃদয়টীকে প্রেমের বাঁশী বাজাইয়া ফুটাইতে পারিব কি ? যাহার এখনি এই সুখের বাসরে নেশার জন্য মন অস্থির হইতে আরম্ভ হইয়াছে সেকি এই নির্ভরশীলা মধুময়ীর মর্ম্ম বুঝিবে ? কিন্তু শরীরের কষ্টসত্ত্বেও সে রাত্রিতে হৃদয়ে এমন ম্লান চিন্তার স্থান রহিল না ; পরক্ষণেই গানের তরঙ্গে প্রাণ ভাসাইয়া দিলাম। কথায় কখনও আমাকে কেহ হারাইতে পারে নাই, আজও পারিল না ; সেই দিনে আমার বাক্‌চাতুরীর প্রশংসা সকলেই করিল, সকলেই আমাকে বড় আমুদে বর বলিয়া সুখ্যাতি করিল ; সোণায় সোহাগা—অমন লেখাপড়া জানা, অমন কৃতী, তাহার উপর অমন রসিক—অনেক শিবপূজার ফলে তাহাঁদের মেয়ের অদৃষ্টে অমন বর জুটিয়াছে, এ মীমাংসায় উপস্থিত হইতে কাহারও বাধিল না। অতি নিরাবিল সহজ আনন্দেই তাহারা তাহাদের সেই মেয়েটীকে লক্ষ্য করিয়া গান ধরিল—

"সোহাগ ভরে তোরই তরে এসেছে রতন
রাখ্‌লো তারে হৃদ্‌মাঝারে করিয়ে যতন।
রাঙ্গারবির আলো উঠেছে
হৃদয়কমল দেখ্‌না ফুটেছে
সদয় বিধি, মিল্‌লো নিধি মনেরি মতন ;
আপন করে তোরে নিয়েছে,
ফুলের বাঁধন পরিয়ে দিয়েছে
মধুর হাসি' ভাবের রাশি তুলেছে নূতন।"

অলক্ষ্যে যে "সদয়বিধি" নিষ্ঠুর হাস্য করিতেছিলেন, তাহা যদি তাহারা তখন দেখিতে পাইত! আমিও তখন ভাবিতেছিলাম, বাস্তবিকই

তো এই যে আমার স্ত্রী—এর অদৃষ্ট সচরাচর বাঙ্গালী গৃহস্থের মেয়ের তুলনায় বড় আশাপ্রদ, বড় উজ্জ্বল। তাহার স্বামী একজন কৃতবিদ্য চাকুরে পুরুষ, যে চাকুরির জন্য সকল শিক্ষিত বাঙ্গালীই লালায়িত সেই বড় চাকুরি তাহার স্বামীর, অতএব সে বড় ভাগ্যবতী। তখনও নিজেকে ভাল করিয়া তো চিনিতে পারি নাই। পঠদ্দশায় যে বিষ আকণ্ঠ পান করিয়াছি, তাহার ফল তখনও তেমন মাত্রায় ফলিতে আরম্ভ হয় নাই।

যাক্, এমনি আমোদে আহ্লাদে সে রাত্রিটা কাটিয়া গেল। প্রভাতে উদার বৈদিক মন্ত্রে সপ্তপদীগমন কুষণ্ডিকা সমাপ্ত হইল—আমাদের ধারণা বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছিল সত্য, তথাপি যখন সেই মন্ত্রগুলি উচ্চারিত হইতেছিল ও আমি ব্রাহ্মণসন্তান যখন পুণ্যফলে সেই মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিতেছিলাম, তখন মনে একটা গম্ভীর ভাবের ছায়া পড়িয়াছিল সে কথা বেশ মনে আছে। মুহূর্ত্তের জন্য বিলাতী শিক্ষার ছায়া জীবন হইতে যেন সরিয়া গিয়াছিল; কবিত্বের প্লাবনে প্রাণ ডুবিয়া গিয়াছিল; যখনই সেই বধূর সলজ্জ মুখখানি দেখিতে পাইতেছিলাম, তখনই কালিদাসের অমর কবিতার সুরে হৃদয় ভরিয়া যাইতেছিল—

"সা লাজধূমাঞ্জলিমিষ্টগন্ধং গুরূপদেশাদ্বদনং নিনায়।
কপোলসংসর্পিশিখঃ স তস্যা মুহূর্ত্তকর্ণোৎপলতাং প্রপেদে॥
তদীয়মার্দ্রারুণগণ্ডলেখমুচ্ছ্বাসিকালাঞ্জনরাগমক্ষ্ণোঃ।
বধূমুখং ক্লান্তচরাবতংসমাচারধূম গ্রহণায় বভূব॥"

এখনও মনে আছে সেই বিদায়ের দৃশ্য—সেই হাতে হাতে সমর্পণ; সেই অশ্রুপূর্ণ মুখগুলি—সেই আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর। আমার জীবনেও সেই দিন একটা পরিবর্ত্তন বোধ করিতেছিলাম, কোথা হইতে আমি একজন অতিথি আসিয়া এই বাড়ীর একটী যত্নে প্রতিপালিত

রত্নটীকে লইয়া চলিলাম, আজ হইতে সে হইল আমার—আমার—আমার; আর কাহারও নয়, এমন আর তো আগে ছিল না; আজ হইতে সে আমার—আমি তা'র! বলিতে কি, আমার পূর্ব্বধারণা ও পূর্ব্বসংস্কারের সম্পূর্ণ বিপরীত হইলেও, সেই মুহূর্ত্তে আমার সমস্ত নিজস্ব যেন সেই বালিকার করে তুলিয়া দিতে প্রস্তুত হইলাম। আমার কঠিন প্রাণ ভেদ করিয়া সেইক্ষণটীতে আমারও নয়নে জল আসিল। সেই ক্ষণে জীবনে যে ত্যাগের ও ভালবাসার বিরাট ছবি প্রতিফলিত হইয়াছিল তাহা লিখিয়া জানাইবার শক্তি আজ আর আমার নাই। আজ ভাবিতেছি, সেই দিনকার আমিই কি এখনকার আমি! যাক্—সেকথা পরে বলিব। এখন যা বলিতেছিলাম তাহাই বলি।

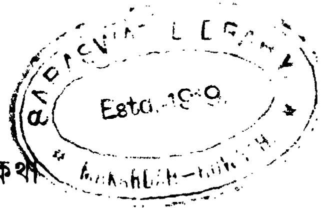
বাড়ী আসিলাম। পিতামাতার আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে নববধূবরণ প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্য্য সমাপ্ত হইল। তারপর ফুলশয্যা। কলেজে যখন পড়িতাম তখন আমি নিজেই আমাদের এই ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হাসি তামাসা করিয়াছি; রবিবাবুর "জীবনে জীবন প্রথম মিলন" ইত্যাদি কবিতার রস উপভোগ করিয়াছি, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সেদিনকার রাত্রে আমি যেন একটা নূতন জীব হইয়া পড়িলাম। আমি চিরদিন কবিতাভক্ত ছিলাম, কবিতায় তখন আমার প্রাণ মস্গুল হইয়াছিল। সব সত্য, কিন্তু তথাপি বলিতে হইতেছে যে সেই বালিকা বধূর নীরব লজ্জা-নম্র-হৃদয়ে কত মধু থাকিতে পারে তাহা সেই রাত্রে কতক অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম। এ যে সত্যই নববধূ

অনাঘ্রাতপুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈঃ
অনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্॥

যদি তাহাকে "অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলম্" বলিয়া লইতে পারিতাম তাহা হইলে হয় তো জীবনের স্রোত ফিরিয়া যাইত—কিন্তু আজ আমার

সেই শুভরাত্রের মধুর স্মৃতিটুকুর উদ্বোধনেরও বুঝি অধিকার নাই। কেন নাই তাহাই এখন বলিব ; আর তাই বলিব বলিয়াই আগে অত কথা বলিয়া ফেলিলাম, নচেৎ আমার বিবাহ, তাতে তোমাদের মাথা ব্যথা কি ?

৩



সতীশের কথা

"তা সত্য কথা বলিতে কি আমার মনে ধারণা হইয়াছিল যে আমি একটা "জিনিয়স্"। সকলে যে ভাবে জীবন যাপন করে সে ভাবে তো আর আমি পারিব না; আমাকে একটা নূতন পথ খুঁজিয়া লইতে হইবে। নূতন পথটা যা বাহির করিলাম তাহা চমৎকার! আমার প্রতিভা যখন সর্ব্বতোমুখী তখন ভুকুড়িনাতের দলে মিশিব কেন, এই মনে করিয়া আমি এবং আমার অন্তরঙ্গ কয়েকজনে মিলিয়া মদ খাইতে আরম্ভ করিলাম। যখনকার কথা বলিতেছি তখন দ্বিজেন কবির "দেবতা খেতো লাল পাণি" ইত্যাদি গানের সৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু আমাদের স্বপক্ষে বড় বড় জিনিয়স্ ছিলেন—মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রাম-গোপাল, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি দেশের প্রতিভাবান্ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা মদ খাইতেন, আমরাও না খাইব কেন? "মদ্যমপেয় মদেয় মগ্রাহ্যম্" এসব বুড়া ঋষিদের কথা অগ্রাহ্য করা তো একটা সভ্যতার লক্ষণ; আমরা কুসংস্কারবর্জ্জিত হইয়াছি তাহার প্রমাণ দিবার জন্যও আমরা মদ ধরিলাম। যখন বিলাতী সভ্যতার প্রথম আম্‌দানি হয়, শুনিয়াছিলাম যে তখনকার কয়েকটী অগ্রসর ব্যক্তি মদ্যপান ও নিষিদ্ধভক্ষ্যভোজন দ্বারা জানাইয়া ছিলেন যে তাঁহারা সভ্য হইয়াছেন, আমরাও অনেকটা সেই পথেই চলিতে লাগিলাম। বড় লোককে অনুকরণ করিলে প্রতিভার কোনও হানি হয় না, কারণ "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ না মনে করেন যে অনুকরণ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইলাম—তাহা হইলে আর জিনিয়স্ হইলাম কি? আমরা তাঁহাদের

টেক্কা দিলাম। আজ সে কথাটা বলিতে লজ্জা বোধ হইতেছে কিন্তু আমার জীবনে তাহার ফল কতখানি হইয়াছিল তাহা জানাইবার জন্য না বলিলেও নয়; তাই চোখকাণ বুজিয়া বলিয়া ফেলিতেছি। আমাদের মনে ধারণা হইয়াছিল যে মদখাওয়া যেমন সভ্যতার একটা অঙ্গ, সকল সভ্যজাতিই মদ খায়; তেমনি ইন্দ্রিয়বৃত্তিচরিতার্থ করাও সভ্যতারই অঙ্গ; দেখায়, শোনায় ভোজনে যদি দোষ না থাকে—তাহা হইলে ইহাতেই বা দোষ কি? বরং হস্ত পদ সঞ্চালনাদিবৎ ইহারও প্রশ্রয় দেওয়াই উচিত ও তাহাই পুরুষার্থ; ইহাকে খর্ব্ব করার চেষ্টা কুসংস্কারমাত্র। নূতন জ্ঞানের আলোকে আমরা দেখিলাম যে ব্রহ্মচর্য্য একটা নিতান্ত কুব্যবস্থা—বলা বাহুল্য যে, ব্রহ্মচর্য্যের কথা কেহ আমাদের শিখায়ও নাই ও সে বিষয়ে আমাদের কোনও ধারণাও ছিল না। তারপর দেশেও এ বিষয়ে দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না, অতএব আমরা নিশ্চিন্তচিত্তে একটা আমোদ ও সুখ ভাবিয়া কুৎসিৎ স্থানে গমনাগমন করিতে লাগিলাম। স্বপ্নেও যেন কেহ না ভাবেন যে আমরা "মনের" খাতিরে অর্থাৎ ভালবাসাবাসির খাতিরে সেখানে যাইতাম; তিনিকড়ি পালের মত "সত্তাখ্যাতি" লাভের প্রয়াস আমোদের মনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান পায় নাই। আমরা কেবল খুঁজিতাম আমোদ অর্থাৎ আমাদের মনে ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থতায় যে আমোদ হয় মনে হইত তাহাই; তা এটা একটা কুসংস্কার বর্জ্জনের অঙ্গ বলিয়াই অমন ব্যবহার করিতাম। সুখ যেমন করিয়াই পাওয়া যায় তাহা লইতেই হইবে, তাহাতে আবার বাঁধাবাঁধি কেন? ইহাই তখন আমাদের মূলমন্ত্র ছিল। বাঁধাবাঁধি যে কোনও আকারে আসুক তাহা আমাদের অসহ্য ছিল; তাই জিনিয়স্ আমি "হিন্দুহোষ্টেল" নামক বহু নিয়মনিগড়াবদ্ধ অস্মদাদি প্রতিভান্বিতের অনাদৃত অধিকাংশই মোটামুটি ছাত্র সম্বলিত

ছাত্রাবাসের নিয়মশৃঙ্খল পদদলিত করিয়া সেই কারাসদৃশ ভবনে পুরুষ-বেশ পরাইয়া বারাঙ্গনার আমদানি করিয়া আমার অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতাম। মনে মনে ভাবিতাম যে, আমার এই অসমসাহসিকতায় নবন্যাস, রমন্যাস, গোয়েন্দাকাহিনী, নাটক সকলই একসঙ্গে সমবেত হইয়া এই বৈচিত্র্যবিহীন "হোষ্টেল" টাকে চকিত বিস্মিত করিয়া তুলিবে। তা কতকটা যে সে ফল ফলিয়াছিল তাহা নহে, ডুকুড়িসাতেরা আমাকে বেশ সম্মানের চক্ষে দেখিত, কেহ বা আমার কাছ হইতে দূরে থাকিত, যেন আমার গায়ের বাতাসেও ভয়ের কারণ আছে। তোমরা আগেই শুনিয়াছ যে, এমন ভাবে জীবন যাপন করিয়াও পরীক্ষাগুলা জলের মত পাশ করিয়া যাইতে লাগিলাম; ইহাতে আবার আমার নিজের উপর বিশ্বাস আরও অটল হইয়া উঠিল—স্বাধীন চিন্তার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা, কুসংস্কারবর্জ্জনের নামে অনাচার, এবং আমোদউপভোগের নামে কদাচারকে বরণ করিয়া লইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিয়া বিশেষ আত্ম-গৌরব অনুভব করিতে লাগিলাম।

মনের যখন এইরূপ অশিষ্ট অবস্থা তখন আবার সোণায় সোহাগা-স্বরূপ আমার চাকরী হইল। মনে করিলাম আমি বঙ্গের দ্বিতীয় বঙ্কিম হইলাম, অচিরেই জগৎকে নিজ প্রতিভার প্রভায় উজ্জ্বল করিয়া তুলিব। চতুর্দ্দিকে আমার জয়জয়কার পড়িয়া গেল। ফুলফুটিলে যেমন ভ্রমরের দল তাহার কাছে ছুটিয়া যায়, মেয়ের বাপেরা তেমনি আমা হেন রত্ন-লাভের আশায় আমার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তারপর আমি বিবাহ করিলাম, সে কথা আগেই বলিয়াছি।

বিবাহ করিলাম বটে, কিন্তু আজ ভাবিতেছি যে আমার বিবাহ না করাই উচিত ছিল। তখন মনে করিয়াছিলাম যে বুঝি আমার জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা এই ঘটনাতে শেষ হইয়া গেল, "বন্য বুট বপন" (Wild

oat sowing) যথেষ্ট হইয়া গিয়াছে। গার্হস্থ্যাশ্রমের উচ্চতা কখনও অনুভব করিতে শিখি নাই, উহাকে কেবল ভোগেরই স্থান বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছিলাম ; গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়াও যে সংযতেন্দ্রিয় হইতে হয়, এ সকল কথা বৃদ্ধের প্রলাপ এই ধারণাই করিয়া রাখিয়াছিলাম, অতএব বিবাহরাত্রের ক্ষণিক উন্মাদনায় আমার জীবনের স্রোত ফিরিল না। লাভের মধ্যে যে হৃদয়টী সম্পূর্ণ নির্ভরতার সহিত আমার কাছে আত্মসমর্পণ করিল, আমার কুৎসিত স্পর্শে সেই হৃদয়টী শুখাইয়া গেল। সে দিন কত আকাঙ্ক্ষায় হৃদয় ভরিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে সব আশা আকাঙ্ক্ষা আজ্ কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। তা হবে না কেন ? মানুষের কর্কশহাতের স্পর্শে লজ্জাবতী লতা শুখাইয়া যায় না কি ? ভালবাসাকোটান, একটী জীবন্ত হৃদয়কে বিকশিত করিয়া তোলা সেটা কি একটা কথার কথা, একটা ছেলেখেলা ? বনমানুষের বীণা বাজান যেমন হাস্যকর, প্রণয়শিল্প না জানিয়া স্ত্রীলোকের প্রণয়লাভের চেষ্টাও তেমনি নিষ্ফল্—এ কথা আজ্ আমি প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিয়াছি। আজ্ আমার ঘাড় হইতে ভূতটা সরিয়া দাঁড়াইয়াছে তাই নিজের হেয়তা বুঝিতেছি, নিজের প্রতি আজ্ ঘৃণা ধরিয়াছে, তাই মনে যাহা উঠিতেছে তাই বলিয়া রাখিতেছি। আমি স্বামী, আমি কোথায় আমার ধর্ম্মপত্নীর চক্ষের সমক্ষে উচ্চ আদর্শ ধরিব, তা না করিয়া তাহার সম্মুখে ধরিলাম একটা পশুর আদর্শ ; পশুকেই বা গালি দিই কেন ? পশুরাই কি আমার মত ঘৃণিত ? আমার মত স্বামী যাহারা, তাহারা কি ভরসায় থাকে ? জন্মজন্মান্তরীণ আদর্শ ও সংস্কার এবং শিক্ষার ফল কতদিন চলিতে পারে ? যদি সে আদর্শ বজায় রাখায় দেশের মঙ্গল, জগতের কল্যাণ এ সব কথা মনে হয় তো এখন হইতে সাবধান হও, নিজের চরিত্র সংযত কর, নচেৎ নিজেরা সর্ব্বদা ভূতের নৃত্য

করিব আর জগতের মাতৃস্থানীয়া স্ত্রীজাতি কেবল আমাদের ভোগের জন্য তোলা থাকিবে, আর তাহাতেও তাহাদের আদর্শ খর্ব্ব হইবে না, সে কথা যে ভাবে, সে নিতান্ত ভ্রান্ত। আমি জানি ও বুঝিয়াছি যে হিন্দুস্ত্রী দেবী—আমি প্রত্যহ সে কথা অনুভব করি ও করিতেছি, কিন্তু শেষ দিনে তবু আমি প্রাণ খুলিয়াই বলিতেছি, যে আমার মত পশুর সংখ্যা যদি হিন্দুসমাজে বেশী হয় তাহা হইলে সে দেবীত্ব তো বজায় থাকিবেই না, বরঞ্চ সে দেবীত্বের দিন যত সংক্ষেপ হইয়া আসে তাহাই বাঞ্ছনীয় হইবে।

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।

এ ভাব যদি তোমরা ভুলিয়া যাও, তবে দেবীই বা দানবী না হইবে কেন? অন্ধ পুরুষ আমরা মনে ভাবি যে আমরাই স্ত্রীলোকের আদর্শ গড়িয়া তুলিয়াছি, কিন্তু সেটা একটা মস্ত ভুল; তাহারাই নিজেদের জীবনের আদর্শ গড়িয়া লইয়াছে, তাহারাই ইচ্ছা করিলে আবার ভাঙ্গিতে পারে ও ভাঙ্গিবে। ক্ষুদ্রচেতা পুরুষ তোমরা মহামায়ার অংশরূপিণী স্ত্রীজাতির সমকক্ষ হইতে পারিবে কি? আজ্ আমি পাগল নই, মাতাল নই, যে ধিক্কারে জীবন ভরিয়া গিয়াছে সেই ধিক্কারের আবেশে এত কথা বলিতেছি, শুনিলে ফল হইবে।

আমি কি ছিলাম, কি হইতে পারিতাম, ও কি হইয়াছি সে কথাটা তবে একবার বলি। বলিয়াছি তো আমি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইলাম। বিবাহের পর একটী মাত্র পুরাতন ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া চাকরীর স্থলে উপস্থিত হইলাম। আর সঙ্গে রহিল আমার মদের বোতল; নেশা বেশ জমিয়া আসিয়াছে, মদ না খাইলে থাকিতে পারি না, রাত্রে প্রত্যহ ঐ চরণামৃতটুকু খাওয়া চাইই। প্রথম প্রথম কাজে বেশ উৎসাহবোধ

হইতে লাগিল—বুদ্ধিবৃত্তির অভাব তো ছিল না, মাথা দ্বারা যতটুকু কাজ হইতে পারে তাহা সহজেই করিয়া ফেলিতে পারিতাম। আমরা নব্যবাবুর দল, আমাদের মাথাই সর্ব্বস্ব, আমরা হারাইয়াছি কেবল একটা অত্যন্ত পুরাতন বস্তু—হৃদয়। ঐটাকে আমরা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় (Superfluous) বলিয়া ফেলিয়া দিয়াছি। যাহা হউক—আমি হাকিম লোক, আমার বন্ধু জুটিতেও বিলম্ব হইল না, খাতির যত্নেরও অভাব হইল না; মনে করিলাম এ স্বাধীন জীবন বেশ কাটিবে। এখানে কাহারও তোয়াক্কা রাখিবার প্রয়োজন নাই, কোনও কাজ কাহাকেও লুকাইয়া করিতে হয় না, বন্ধুদের সহিত আমোদপ্রমোদে, সাহিত্যচর্চ্চায় দিন কাটিতে লাগিল মন্দ নয়। এমনি নিরীহভাবে যদি জীবনটাকে চালাইয়া যাইতে পারিতাম তাহা হইলে আজ আমার এ দুর্দ্দশা হইত না; কিন্তু ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে?

ইয়ারের দল যত বাড়িতে লাগিল, আমার অত্যাচার ততই বাড়িতে লাগিল; মদের মাত্রা বাড়িতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে—সেটাও কি আর বলিয়া জানাইতে হইবে। তখনও কাজে মন ছিল, কাজে সুনামও ছিল; প্রমোশন যা হইবার তাহা হইতেছিল। এইরূপে দুইতিন বৎসর কাটাইবার পর, আমার একত্ব ঘুচিল—কর্ম্মস্থলে আমার পরিবার আসিলেন। এই সময় হইতে আমার জীবনটা বদ্‌লাইয়া ফেলাই উচিত ছিল, দিনকতক যে অল্পমাত্রায় বদলাইল না তাহা নহে; প্রথম প্রথম জানিতে দিই নাই যে আমার মদ না হইলে চলে না। প্রথম প্রথম তাহার দিন বেশ কাটিতে লাগিল, ডেপুটী বাবুর পত্নী আদর অভ্যর্থনার ত্রুটী নাই, ফুটন্ত জীবনে এগুলি তাহার ভালই বোধ হইয়াছিল; আজ এখানে, কাল সেখানে করিয়া, প্রথম সংসারের কর্তৃত্ব অধিকার করিয়া জীবনে বেশ একটু নূতনত্ব অনুভব করিতেছিল।

তার উপর তখন আমারও মনে একটা ক্ষণস্থায়ী ভাবের আবেশ আসিয়াছিল, আমিও তাহাকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, কথাবার্ত্তায়, কবিতা চর্চ্চায়, নানাস্থান দেখাইয়া, নানা চিত্তবিনোদনের উপায় উদ্ভাবন করিয়া তাহাকে প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। তখনও সে আমাকে চিনিতে পারে নাই, তাহার মনে স্বামী-গর্ব্ব যথেষ্ট ছিল। মূর্খ আমি—কিসের মোহে তাহাকে অবহেলা করিতে শিখিলাম? আজ বলিয়া যাই যে সে রত্নকে মাথায় করিয়া না রাখিয়া অন্ত আমোদের জন্য লালায়িত হওয়াই আমার পক্ষে কালস্বরূপ হইল। ক্রমে ক্রমে সে জানিতে পারিল যে আমি মদ খাই, মদ খাইয়া কখনও কখনও আত্মবিস্মৃত হই। গোড়ায় তাহাকে বুঝাইতাম যে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি তাই একটু স্ফূর্ত্তির জন্য, একটু শরীরের আরামের জন্য মদ খাই। এই রকম করিয়াই যোগেশ জ্ঞানদাকে বুঝাইয়াছিল। আমার জীবনটা কি গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার চক্ষে বহু পূর্ব্বেই ধরা পড়িয়াছিল, না আমার মত হতভাগ্য জীব আরও আছে? না, আমারই মত আর কোনও অধমকে দেখিয়া মহাকবি তাঁহার যোগেশ চরিত্র গঠিত করিয়াছিলেন?

এ কথা বলিতে পারি না যে চরিত্র সংশোধন করিবার ইচ্ছা আমার আদৌ আসিত না; কিন্তু কোন একটা প্রবল আকর্ষণে সেই সদিচ্ছা ভাসাইয়া দিত, মদ না হইলে প্রাণ আইঢাই করিত। শুনিয়াছি, কোনও আফিংখোর নাকি স্ত্রীর সতীত্বের বিনিময়েও আফিং খাইতে চাহিয়াছিল, আমারও যে সে দুর্দ্দশা হয় নাই, তাহার কারণ আমার গুণে নয়—আমার সেই সহশীলা ও পতিময় জীবিতার চির জন্মার্জ্জিত পুণ্য ও শিক্ষার ফলে। যে দিন আমি সেই আনন্দময়ীর, সেই একান্ত নির্ভরশীলার আনন্দময় হৃদয়ে নিরানন্দ আনিলাম, সেই দিনই মরিলাম

না কেন? বলিয়াছি তো আমার চরিত্রের মেরুদণ্ড সংসারে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, ধর্ম্ম বলিয়া কোনও জিনিষ আছে তাহা আমরা স্বীকার করিতে শিখি নাই; বরং ওটা যে নিতান্ত ছেলেদের কুকুর ভয় দেখাইয়া শাসনের মত লোকশাসনের উপায় মাত্র, এই ধারণাই আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। যে ভালবাসায় মানুষকে মানুষ করে, স্বার্থত্যাগী করে, স্বর্গের আলোক দেখাইয়া দেয়, সে ভালবাসার নামগন্ধও কখনও বুঝি নাই, যাহাকে জীবন উৎসর্গ করিয়া সুখী করা উচিত ছিল, তাহার জন্য সামান্য কুঅভ্যাসও তো ত্যাগ করিতে পারিলাম না। এই শক্তি লইয়া মানুষ আত্মশক্তির বড়াই করে, এই অপদার্থ আমি, আমি কিনা উচ্চশিক্ষার বড়াই করি, কবিতা-চর্চ্চার দাবী করি, প্রখর বুদ্ধির অভিমান করিয়া বেড়াই। মরণের মুখে আসিয়া এ কথাটা মনে না আসিয়া যদি আগে আসিত তাহা হইলে আমি হয় তো একটা মানুষের মত মানুষ হইতে পারিতাম, কিন্তু তাহা হইল কৈ? আমার বোধ হয় যাহারা মনে মনে জানে যে তাহারা দুর্ব্বল, আর সেই দুর্ব্বলতার জন্যই কুকার্য্য করে, তাহারা সাম্‌লাইলেও সাম্‌লাইতে পারে, কিন্তু আমি যে অন্যধরণের, আমি তর্ক করিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাই যে আমি যাহা করি তাহাতে কোনও দোষের বিষয় নাই; আমি যে মনে মনে আঁচিয়া রাখিয়াছি যে জন্মান্তর বা অদৃষ্ট লোক ঠকাইবার জন্য কল্পিত কথা মাত্র। আমি যে নাস্তিক—আমার খুঁটার জোর ছিল না। আমি তাই সাম্‌লাইতে পারিলাম না; আমার অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছিল, সে অধঃপতন কতদূর গড়াইয়াছিল তাহা আজ বলিয়া যাইব—দেখি যদি কাহারও চেতনা হয়।

৪

সতীশের কথা

"ক্রমে ক্রমে আমার ত দুইটী সন্তান হইল; সন্তান হওয়ায় যে আনন্দের কথা তাহা সম্পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিবার ক্ষমতা আমার ছিল কিনা জানি না; আমি তখন পূরামাত্রায় মাতাল হইয়া উঠিয়াছি। তখনও কিন্তু আমি বড় চাকুরে; অতএব লোকতঃ এই শুভ-সংবাদে যে আনন্দ করা উচিত তাহার ত্রুটি হইল না। অন্ততঃ আমার স্ত্রীর পক্ষে এ একটা সুবিধাই হইল, কারণ তাহার অশান্তিপূর্ণ জীবনে একটু আনন্দ লাভের আশা হইল: ছেলেমেয়ের মুখ চাহিয়া আমার অনাচার অত্যাচার কতক ভুলিবার অবকাশ পাইল। কিন্তু আমি যখন সজ্ঞানে থাকিতাম তখন মনে একটা বিষম চিন্তার উদয় হইত, আমি মাতাল, আমি মাতালেরও অধম, কারণ আমি কুৎসিত আমোদাসক্ত, আমার সন্তান হওয়া ভাল হইল কি? আজ্‌কালকার মানুষ আমরা, ভুলিয়া যাই যে জগতে যত দায়িত্ব আছে তাহার মধ্যে পিতৃত্বের দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা গুরু। এই যে দুইটী জীব আমাকে অবলম্বন করিয়া জগতে সৃষ্ট হইল তাহাদের মানুষ করিতে যত আয়াস, যত ধৈর্য্য, যত ত্যাগের প্রয়োজন, আমার সে সকল কোথায়? কিন্তু এ সকল চিন্তা হৃদয়ে আসিয়াই তখনি বিলীন হইয়া যাইত; ভাবিবার আমার অবকাশ কোথায়? মদ খাইলেই সব চিন্তা দূর হইয়া যায়, নেশার ঘোরে সময় কাটিয়া যায়। ভবিষ্যতে কি হইবে সে ভাবনা ভাবিবার আবশ্যক কি? আজ্ যে তাহাদের কি অবস্থা হইয়াছে, বা ভবিষ্যতেই বা কি হইবে, তাহা তখন ভাবিবার সময় বা

প্রবৃত্তি হয় নাই, তাই ছেলে আমার পর, এই শেষ মুহূর্তে স্ত্রী-পুত্রের মুখ দেখা আমার অদৃষ্টে হইল না। যাক্—এখনকার কথা যাহা বলিতেছি, তাহাই বলিয়া যাই।

সকল কবিরাই বলিয়া গিয়াছেন যে যতদিন ফুলে মধু থাকে ততদিনই ভ্রমর আসিয়া জুটে, মধু ফুরাইলেই ভ্রমর ভায়ারা পলায়ন করেন, আমি তখনও মধুময় পুষ্প, অতএব তখনও আমার ভ্রমরের দলের অভাব ছিল না। পরের পয়সায় আমোদ করা এ প্রলোভন কি সহজ? এই জাতীয় অনেকেই আমার বাসায় আসিয়া আমার গুনগান করিত, বন্ধুত্বের দাবী করিত, মদ খাইত, আমার সদুপদেশ দিবার বড় কেহই ছিল না। সদুপদেশ পাইলেই যে আমি চরিত্র সংশোধন করিতাম, বা অভ্যাস বর্জ্জন করিতাম, সে কথা যদি বলি তাহা হইলে মিথ্যা কথা বলা হয়, তাহা হইত না, কারণ আমি যখন আমার ধর্ম্মপ্রাণা পত্নীর কাতর ভিক্ষা অবহেলা করিয়াছি, পুরাতন ভৃত্যের অনুরোধ তাচ্ছিল্য করিয়াছি তখন যে কাহারও উপদেশ শুনিতাম তাহা কেমন করিয়া বলি? স্ত্রী—তাহার তো স্ত্রীবুদ্ধি আর তাহার দাবী আদর যত্ন, খাওয়া পরা, এর বেশী তো নয়। আর ভৃত্য—সে যতই পুরাতন হউক, আমার পিতা তাহাকে যতই আত্মীয় ভাবুন, সে তো ভৃত্য, আমি তাহাকে ভৃত্যের অধিক সম্মান দিতে পারি না, অতএব তাহার কথারই বা মূল্য কি? আমি আমোদ করিব, হইলামই বা মাতাল, তাহাতে ইহাদের আসে যায় কি? লোকে এইরূপেই অধঃপাতে যাইবার অছিলা খোঁজে।

কিন্তু এ ভাবেই যে বেশী দিন চলিল তাহা নহে, আমি যে মাতাল তাহা তো অপ্রকাশ থাকিবার নয়, সকলেই সেটা জানিতে পারিয়াছিল। কিন্তু যাবৎ এই মাতলামোর জন্য কাজের ক্ষতি হয় নাই তাবৎ কেহই কিছু বলিতে সাহস করে নাই, আমিও বড় একটা কাহাকেও গ্রাহ্য করিতাম

না। কাহাকেও খাতির করা বা কাহারও মতের অপেক্ষা করা আমার কোষ্ঠীতে লেখে নাই। ক্রমে কিন্তু কাজেও অবহেলা আরম্ভ হইল, কাজে ক্রমে দিনের বেলাও মদ খাওয়া আরম্ভ হইল, ভুল হইতে লাগিল। মদ খাইলে হুঁস থাকে না, কি করিতে কি করি, কি লিখিতে কি লিখি, তাহার ঠিক থাকে না। কত দিন আর এসব চাপিয়া রাখা যায়? কাজেই আমার কাণ্ড ওপরওয়ালার কাণে উঠিল। তিনি আমাকে একটু ভালবাসিতেন বলিয়াই, আমাকে অপমানিত হইয়া বিদায় হইতে হইল না, আমাকে কাজে ইস্তফা দিবার সুবিধা দেওয়া হইল। জীবনে মদ খাওয়ার প্রথম কুফল ফলিল।

চাকরিতে জবাব দিয়া বাড়ী ফিরিলাম। আমার স্ত্রী এই দারুণ সংবাদে একেবারে নিরাশার ও অনুতাপের স্রোতে ভাসিয়া গেল। আমার কিন্তু তখনও নৈরাশ্য স্পর্শ করে নাই, তাহার কারণ সেই ধাক্কায় আমার একটু চৈতন্য হইয়াছিল, বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে যে পথে চলিলে আমার যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারিত, যথেষ্ট সুনাম হইতে পারিত, নিজের দোষে সে পথ হইতে চ্যুত হইলাম। সেই জ্ঞান হৃদয়ে আসায় তখন অন্ততঃ মনে করিয়াছিলাম যে আমি যদি কু-অভ্যাস ত্যাগ করি তাহা হইলে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ভাবি কেন? কত পথ রহিয়াছে—আমার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধির সাহায্যে যে পথই অবলম্বন করিনা কেন, আমার একটা উপায় হইবেই। আপাততঃ একটু সামলান প্রয়োজন মাত্র। স্ত্রীকে প্রবোধ দিলাম যে "গোলামি ঘুচিয়াছে ভালই হইয়াছে—আমি বি, এল, পাশ করা; ওকালতি করিয়া অথবা অন্য কোনও প্রকার স্বাধীন ব্যবসায় দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিব, এত ভাবনা কিসের? এখনি তো খাবার ভাবনা ভাবিতে হইবে না, তার জন্য তো কিছু সংস্থান আছে। এত অধীর হও কেন?" হায় রে মূর্খ আমি—আমি কি বুঝিব তাহার ব্যথা?

সে যে কেন এত অধীর হইয়াছিল তাহা আমি এখন বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি যে আমি যতই হীন হই সে আমার অপমানে মর্ম্মাহত হইয়াছিল, আমার উন্নতির আশা, মান সম্ভ্রম, প্রতিপত্তি এই এক ঘটনায় নষ্ট হইয়া গেল সেই ভাবিয়াই সে অধিক অধীর হইয়াছিল, তাহার খাবার ভাবনা ছিল না। সে যে ঘরের মেয়ে, সে ঘরে তাহার খাবার অভাব হইবে না তাহা সে কি জানিত না? আমি যতই হেয় হই—তাহার কাছে হেয় নই—এই হীন অধমকেও সে প্রাণের সহিত ভালবাসিত, তাই তাহার এই যন্ত্রণা। ইহার উপর এত দিনেও কি আর সে আমাকে বুঝিতে পারে নাই? আমরা নিজেদের বুদ্ধির গর্ব্বে মনে করি যে স্ত্রীজাতির বুঝি বুদ্ধির অভাব; তাহাদের স্বভাব সুলভ সহজ বুদ্ধি আমাদের বুদ্ধি অপেক্ষা কিছু কম নয় তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। সে কি বুঝিতে পারিতেছিলনা, যে, আমি এখন যাহাই বলিয়া প্রবোধ দিই, কাজে তাহা করিতে পারিব না, যে আমি সামান্য নেশার বশবর্ত্তী হইয়া আপাততঃ সকলই বিসর্জ্জন দিলাম, কুলের কলঙ্কস্বরূপ হইলাম, সকলের সমক্ষে হীন মাতাল বলিয়া প্রতিপন্ন হইলাম, সেই আমি যে কখনও এ অভ্যাস ত্যাগ করিয়া আবার মানুষ হইয়া এ কলঙ্ক অপনোদিত করিতে পারিব সে আশার মূল্য কত? তবে সে যে শান্ত হইল তা আমার কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া নয়, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া; আমার মত লোকের হাতে পড়িয়াও তাহার ভগবানে বিশ্বাস ঘুচে নাই। আমার কিন্তু তখনও সে সান্ত্বনা হৃদয়ে আসিতেছিল না, বরং বিপরীত দিকেই মন দৌড়িতেছিল। তখনও এপিকিউরসের বা চার্ব্বাকের মতন মনে মনে ভাবিতেছিলাম—কোথায় তোমার ভগবান—ভগবান যদি সর্ব্বশক্তিমান্ তবে আমার মদ্য-পান প্রবৃত্তি ঘুচাইতেছেন না কেন? ভগবান্ যদি দয়ালু তবে আমি ভদ্রব্রাহ্মণ সন্তান এমনভাবে লাঞ্ছিত হইলাম কেন? তখনও আমি

যুক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিলাম—আমি দেবতার স্থলে যুক্তিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি—ভুলিয়া গিয়াছি—আমাদের সকল কার্য্যে যুক্তি পথ প্রদর্শক হইলেও তাহাকেই যদি দেবতার স্থানে বসাই তাহা হইলে ঐ যুক্তিই আমাদের পাপের পথে লইয়া যায়। ইহাতেই আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে—আজ উহারই জন্য আমার এই অবস্থা। অনেক সময় হৃদয়ের দিক্ দিয়া দেখিলে সুফল হয় সে কথা আমাদের মনে থাকে না। বোধ হয় সেই জন্যই ইহ জীবনে ভাল হওয়া আর আমার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিল না। এ সব কথা মনে আসিতেছে বড় শেষ দশায়—ইহাই দুঃখ!

আমায় প্রায় একমাস সেখানে থাকিতে হইল—পদত্যাগের মঞ্জুরি আসা' জিনিষ পত্রের বিলি ব্যবস্থা করা, এ সকল কার্য্যে, চাকুরি ছাড়ার পরও একমাস থাকিতে হইল। আমার সেই সব বন্ধুবর্গ কোথায়? যাহারা নিত্য আমার বাটীতে আসিয়া আমোদ প্রমোদ করিত তাহারা একে একে সরিল কেন? আমি এখন আর তো ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট নহি, একজন লাঞ্ছিত বেকার ব্যক্তি, অতএব এখন আমি পতিত, দীন-হীন, এখন তাহারা আর আমার সঙ্গে প্রণয় বজায় রাখে কেমন করিয়া? ইহারাই হয়তো আমার অন্তরালে আমাকে মাতাল বলিয়া উপহাস করিতেছে—আমার যে এমনি পতন হইবে তাহা যেন, তাহারা অনেকদিন হইতেই জানিত এই রূপে আত্মবুদ্ধির প্রশংসা করিয়া আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছে। ইহারাই তো ভগবানের সৃষ্ট মানুষ, তবে এ সৃষ্টির জন্য ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ হইব কেন? এই ঘটনায় আমার মনের ভাবটা ক্রমে এরূপ তিক্ত হইয়া দাঁড়াইল। ইহাতে আমার এই লাভ হইল যে ধর্ম্মের প্রতি তো কোনও দিন আস্থা স্থাপন করিই নাই; চিরকাল তর্ক করিয়া আসিয়াছি যে মানুষকে ভয় দেখাইয়া সমাজ বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য ধর্ম্মবস্তুর সৃষ্টি—ভগবানের কার্য্যে সকলেই অসন্তুষ্ট অথচ

ভয়ে ভয়ে তাঁহাকে সর্ব্বগুণে বিশেষিত করিয়া কতক সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করে, এখন ধর্ম্মের দিকে মন যাওয়ার পরিবর্ত্তে ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধিটাই বাড়িয়া গেল। তা যাক্ ; কিন্তু মোটের উপর আমি তখনও মানুষ মন্দ ছিলাম না, খল কপটতায় আমার হৃদয় পূর্ণ হয় নাই—সারল্য ছিল ; ভুল হইলেও আনন্দের দিকে প্রবণতা ছিল। তোমরা একথা শুনিয়া হাসিও না—মাতাল হইলে লোক খারাপ হয় না—আমি অনেক মাতাল দেখিয়াছি যাহারা দেবতার মত লোক, লোকে তাহাদের সেই রকমই সম্মান করে। আমি যে সেই সম্মানের দাবী করিতেছি তাহা নহে, তবে এ সুখটুকু আমার হৃদয় হইতে কাড়িয়া নিও না, যে আমি অনেক অপ্রমত্ত, হীনহৃদয়, প্রতি পদবিক্ষেপে আত্মস্বার্থপোষণনিবিষ্ট ব্যক্তি দেখিয়াছি যাহাদের দেখিয়া আমাহেন লোকও যেন ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমি মাতাল ছিলাম কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর ছিলাম না। আমি হাসিতে হাসিতে কাহারও গলায় ছুরি বসাইতে পারিতাম না।

তা একটা কথা বলি—এই যে পদত্যাগ, ইহাতে অমঙ্গল কতটুকু হইয়াছিল তা জানিনা, ইচ্ছা করিলে আমি এই অমঙ্গলকে সুমঙ্গলে পরিবর্ত্তন করিতে পারিতাম তো, আর তখন মনেও সেই আশাই জাগিতেছিল। যার জন্যই হউক সে সময়টা আমার মনে একটা বিরাট মুক্তির আনন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। আর তো এখন আমি পরের চাকর নই—আমি স্বাধীন হইয়াছি—ইহাতে নিরানন্দের মাঝ দিয়া একটা উৎফুল্লতা অনুভব করিয়া বাঁচিলাম। আমার বিষাদ-ক্লিষ্টা পত্নী সুহাসিনীও সে ভাবটুকু ধরিতে পারিল।

আর একটা কথা বলা আর কি আমার শোভা পায় ? তা বলি—আমার জন্য তত নয়, তারই জন্য বলিয়া যাই। এই সময়টাতে আমার আর একটি আনন্দের হেতু উপস্থিত হইয়াছিল—আমি তাহাকে বুঝিতে

পারিতেছিলাম; পাছে আমার মনে কোনও কষ্ট হয়, পাছে আমি পদত্যাগ জনিত ক্লেশে ও অপমানে আত্মহারা হই সেই আশঙ্কায় সে আমাকে সর্ব্বদাই ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিত; কোনও সামান্য বিষয়েও আমার কোনও অসুবিধা না হয় সে দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিত। এই সময়ে সে যে আমাকে আকর্ষণ করিবার জন্য প্রবল প্রয়াস পাইয়াছিল তাহা কেবল মন দিয়া নহে, দেহ দিয়াও। তাহার যত সৌন্দর্য্য যেন এই প্রয়াসে কেন্দ্রীভূত করিয়াছিল, তাহার যত অস্ত্র ছিল সবই সে এই প্রযত্নে প্রয়োগ করিয়াছিল; ক্ষণেকের জন্য আমিও বুঝিয়াছিলাম যে, সে আমার

গৃহিণী সচিবঃ সখীমিথঃ
প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

তাহাকে অবহেলা করিয়া কি লাভ করিলাম? আমার অমৃতে অরুচি, গরলে শ্রদ্ধা হইল কেন? এই অমৃত পান করিয়া অমর হইলাম না কেন? প্রতিদিন যেমন কতশত পাপী গঙ্গাস্নান করে—স্নানকালে হয়তো মনে ক্ষণিক উত্তেজনার উদ্ভব হয়, পরে যেমন ছিল তেমনি হইয়া যায়, আমারও তাহাই হইল। ঐ পূত জাহ্নবীর জলে অবগাহন করিয়াও আমার মনের ময়লা একেবারে ঘুচিল না; অল্পটুকু ঘুচিয়াছিল, তাহাতেই জীবনে যে পবিত্রতা ও সুখের আভাস পাইয়াছিলাম আজ শেষ জীবনে সেই স্মৃতির উদ্‌যাপন করিয়াও যেন পবিত্র হইলাম বলিয়া মনে হইতেছে।

সতীশের কথা।

"নাটকের একটা অঙ্ক শেষ করিয়া, আর এক অঙ্কের জন্য অপেক্ষা করিবার সময় যেমন ঐক্যতান বাদ্য হয়, আর সেই সময়ে বহুবিধ দর্শক-শ্রেণী বাহিরে গিয়া পান চুরুট খায়, চাকুরি যাওয়ার পর যে কয় দিন প্রবাসভূমে থাকিলাম সেই কয় দিন আমার প্রাণের রঙ্গালয়ে সেইরূপ ঐক্যবাদন চলিল—দর্শকেরা সব চলিয়া গেল—রহিলাম আমরা দুইজনে, সেই সময়টুকু দুজনেরই হৃদয়ে যেন সপ্তস্বরার রাগিণী ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল; ক্ষণেকের তরে উচ্ছৃঙ্খল হৃদয়ের দুর্দান্ত বাসনারাশি যেন শান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। মনে হইল—যেন এ একটা নূতন অভিসার, যেন আমি ভুলিয়া কোনও অজানা রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি; মন যেন সেই রাজ্যের রাণীকে কাতরস্বরে বলিতেছে,

"ক্ষণেকের তরে ভুল ভাঙ্গায়ো না
এসেছি ভুলে।"

এই সুখের রেশ থাকিতে থাকিতে যবনিকা উঠিল; জীবনের নূতন অঙ্ক আরম্ভ হইল। আমি কোনও একটা নূতন স্থানে গিয়া জেলা কোর্টে ওকালতি আরম্ভ করিলাম। এ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে সকলেই মোহিত হইল। অর্থাৎ সকলে বুঝিল যে আমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বলিবার ক্ষমতা সুন্দর, মোকদ্দমা করিবার শক্তিও মন্দ নয়। সেখানকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীলেরা আমাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন, আমার পসার হইতে লাগিল, অর্থাগম হইতে লাগিল মন্দ নয়। মদ খাইতাম কিন্তু তখনও

মাত্রা নিতান্ত বাড়ে নাই। কিন্তু আমার ভিতরে কুঅভ্যাসটা ফটাবদ্ধ বিষধরের ন্যায় গর্জ্জাইতে লাগিল, যেন ছাড়া পাইলেই আমাকে মর্ম্মান্তিক দংশন করে। যে কষ্টে উহাকে চাপিয়া রাখিয়াছিলাম তাহা আমিই জানি—কেবল নষ্ট খ্যাতির পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলাম বলিয়াই অত কষ্ট করিয়াও উহাকে তখনও মাথা তুলিতে দিই নাই। এই সুসময়ে যদি মদ ছাড়িতে পারিতাম তাহা হইলে আজ হয়তো দেশের একজন অগ্রণী হইতে পারিতাম। মদ্যপানকে যদি দোষের বলিয়া ভাবিতাম তাহা হইলে হয়তো এ অভ্যাস ছাড়িলেও ছাড়িতে পারিতাম। কারণ আমি দেখিয়াছি যে কত লোক চিরদিনের অভ্যস্ত মদ্যপান এক দিনে ছাড়িয়া দিয়াছে—ইহারা মদও খাইত এবং তাহার জন্য অনুতপ্তও হইত, তাই ছাড়িতেও পারিয়াছিল। আমি কিন্তু এখনও মদকে ঘৃণা করিতে শিখি নাই; বরং মনে করিতাম যে মদ্যপান যদি পরিমিত মাত্রায় করা যায় তাহা হইলে দোষের হয় না, বরং তাহাতে শরীরে স্ফূর্ত্তি থাকে, মনে উল্লাস আসে। এইরূপে মনকে চোখঠারিয়া সাপটাকে মারিলাম না—তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিলাম—পরে মরিবার জন্য।

সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, যত দিন আমি পরিমিত মাত্রায় মদ্যপান করিয়াছিলাম, তত দিন দিনগুলা বেশ সুখে কাটিয়া গিয়াছিল। এই সময়ে আমার অর্থস্বচ্ছলতা হইয়াছিল; সংসার বেশ সুখে চলিতেছিল। ইচ্ছামত সন্তানসন্ততির মনস্তুষ্টি করিতে পারিতেছিলাম' স্ত্রীর মনোরঞ্জন করিতেছিলাম। আমার এখন মনে হয় যে এই সময়টাই তাহার জীবনে সুখের সময় হইয়াছিল। আমার মদ খাওয়াটা তাহার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, প্রথম জীবনে ইহার দ্বারা যে তাহার ঘৃণার সঞ্চার হইত এখন আর ততটা হইত না, কারণ সে বুঝিয়াছিল যে মদ একটু করিয়া না খাইলে আমি থাকিতে পারিব না; এই জন্য সেই নেশাটা করা

যেন আমার স্বাভাবিক জানিয়া উহাতে বিরক্ত হওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। তামাক খাইলে স্ত্রী বিরক্ত হইতে পারে কিন্তু সেটা বিশেষ কোনও দোষের বিষয় নয় ভাবিয়া যেমন সহ্য করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, আমাব স্ত্রীও আমার এখনকার মদ্যপানটাও সেইরূপ ভাবে সহ্য করিতে শিখিয়াছিল। যদি সে সময় কোনও প্রকার জোর করে তাহা হইলে হয় তো বিপরীত ফল হইতে পারে এমনও আশঙ্কা তাহার মুখে চোখে কখনও কখনও ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছিলাম মনে হয়। কে জানে হয় তো তাহাই হইত অথবা হয় তো উহাতে সুফলও ফলিতে পারিত; যেন তেন প্রকারেণ তাহা হইল না, আমার মদ খাওয়া ছাড়াও হইল না। এই সময়-কার কথাই বেশী করিয়া বলিতে ইচ্ছা হইতেছে ঐ সুখস্মৃতি আজ আমার হৃদয়ে বিষামৃতের সৃষ্টি করিয়াছে। আজ দেখিতেছি—আমার গৃহলক্ষ্মী, গৃহদেবতা গৃহ উজ্জ্বল করিয়া সংসারের সৌন্দর্য্য যে কি তাহাই জানাইবার জন্যই যেন সকলের সুখস্বচ্ছন্দতা বিধানে তৎপরা। এখন যেমন দেখিতেছি তখন তেমন করিয়া দেখিতে পারি নাই কেন? এখন দেখিতেছি কখনও সে কর্ত্তৃত্বগৌরবে গম্ভীর মূর্ত্তি; তাহার ক্ষুদ্ররাজত্ব যেন তর্জ্জনী হেলনে অবলীলা ক্রমে চালাইতেছে।

অভিজনবতো ভর্ত্তুঃ শ্লাঘ্যে স্থিতা গৃহিণীপদে
বিভব গুরুভিঃ কৃত্যৈরস্যচ প্রতিক্ষণ মাকুলা।

কখনও বা মাতৃত্বানুভূতিতে তাহার মুখে অপূর্ব্ব জ্যোতি ফুটিয়া উঠিত যেন তাহার চক্ষে স্নেহের উৎস উছলিয়া উঠিত, যেন তাহার হৃদয়ে শত আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করিত।

তমীক্ষমাণা ক্ষণমীক্ষণানাং
সহস্রমাপ্তুং বিনিমেষ মৈচ্ছৎ।

স্থনন্দান্ লোকান্ কৌতুকেন
ক্ষণং ক্ষণং তৃপ্যতি কস্ত চেতঃ ॥

সেই সঙ্গে আমার চিত্তও আমার সন্তানগণের প্রতি ছুটিয়া যাইত, ক্ষণিক মোহে হৃদয় আচ্ছন্ন হইত। হায় নিরপরাধী জীববৃন্দ! কেন তোমরা আমার সন্তান হইয়া জন্মিয়াছিলে? আমি তোমাদের মুখ চাহিয়া ভাল হইলাম না কেন?

আজ্ বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, চরিত্রসংশোধন করিবার জন্য কোনও দিন আমার প্রযত্ন ছিল না; যদি তাহা থাকিত, তাহা হইলে কি আমি শোধরাইতে পারিতাম না? "যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ"—তা যত্ন কি সত্যই কখনও করিয়াছিলাম? বরং আমার ধারণা হইয়াছিল যে, যত্ন করা বৃথা, আমি মদ ছাড়িতে পারিব না; ওটা আমার প্রকৃতির সহিত মিশিয়া গিয়াছে; এখন ছাড়িবার চেষ্টা করিলে আমার শরীরেব ও মনের অনিষ্ট হইবে। এই রকম অবস্থাতেই দিন কাটতে লাগিল। আমার সন্তান সংখ্যার বৃদ্ধি হইতে লাগিল, প্রসার প্রতিপত্তিরও বৃদ্ধি হইল।

বলিতেছিলাম না তাহার মাতৃমূর্ত্তির কথা? কে যেন আমাকে সেই মাতৃত্বের দাবীতে বেশী করিয়া আকর্ষণ করিতে চাহিত; যেন কে সেই শিশুগুলির দিকে লক্ষ্য করিয়া আমাকে সর্ব্বদাই ভুলাইবার চেষ্টা করিত যে, উহারাই আমার সংসারের সর্ব্বস্ব—আমার আর কি চাই? তাহার প্রতি-কার্য্যে যেন সেই মাতৃত্বের গৌরব ফুটিয়া উঠিত; যেন সে তাহার মুখের হাসিতে চ'খের ইঙ্গিতে বুঝাইতে যত্ন করিত:—

জান কি মায়ের মন?
যেই দিন তনয়ে জঠরে ধরে
সেই দিন হ'তে দিন দিন গাঁথা রহে স্মৃতি মাঝে।"

আমি এখন বুঝিতেছি যে, ছেলেদের জন্যই সে আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। তবে কি সে আমা অপেক্ষাও ছেলেদের বেশী ভালবাসিত? নিশ্চয়ই বাসিত, তাই তোমারই মত ছেলের জন্য সে স্বামীকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। সে কথা পরে বলিতেছি।

কিন্তু তাই বলিয়া কি সে আমাকে কম ভালবাসিত? সে সময়কার স্মৃতি কি করিয়া মুছিয়া ফেলিলাম আজ্ তাহাই ভাবিতেছি; আজ্ নির্ব্বাণের পূর্ব্বে একবার যেন দীপটী উজ্জ্বল ভাবে জ্বলিয়া উঠিয়াছে আমার জীবনে সমস্ত স্মৃতি, সমস্ত কবিত্ব, সমগ্র সুখ দুঃখ যেন আজ্, হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের সৃষ্টি করিয়াছে, তাই তোমাদের সেই সুখের কথা বলিয়া যাইতেছি। আজ্ আমি মাতাল নই, আমার সব নেশা কাটিয়া গিয়াছে—আজ্ আমি মাতাল নই—কিন্তু আজ্ আমি পাগল হইয়াছি; স্মৃতির দংশন সহ্য করিতে না পারিয়া পাগল হইয়াছি, পাগলের কথা কেহ শুনিবে কি?

মনে পড়িতেছে তাহার কোমল হৃদয়ের কমনীয় প্রথা—তাহার হৃদয়ভরা স্বামি-সোহাগ। তাহার যে সেই সময়কার আদর, যত্ন ভালবাসা ঢালিয়া আমাকে আচ্ছন্ন করিবার প্রয়াস তাহা আজ্ বেশ মনে পড়িতেছে। তাহার হৃদয়ে কোন্ রত্ন ছিল না? ছিল না বাচালতা, প্রগল্‌ভতা, কথার বাঁধুনি, ভালবাসার ছাঁদনি। তাহার নীরব প্রণয়ের মর্ম্মান্তিকতা আমি কি বুঝিতে পারিয়াছিলাম? আমার মত লোকে কি ভাল বাসিতে পারে, না ভালবাসা বুঝিতে পারে এবং এমনও সন্দেহ আমার মনে আসিয়াছে যে, আমার মত লোককে কেহ ভালবাসিতে পারে না। তাই বলিয় তখন এ সব কথা মনে আসে নাই, আসিতেও পারে না, কারণ সে দিন-গুলা বলিতে কি—বড় সুখেই কাটিতেছিল। কেন জান? আমার টাকা হইতেছিল বলিয়া নহে—আমি তখন ভয়ানক ছিলাম না বলিয়া। আমি এমন অনেক মূর্খ দেখিয়াছি যাহারা বালিকা বধূকে ভয় দেখাইয়া বকিয়

ধমকাইয়া বশীভূত করিতে চাহে, ইহারা প্রণয়শিল্পের কথাও বোধ হয় জানে না। আমি যদিও এমন করিয়া তাহার হৃদয় সঙ্কুচিত করিবার চেষ্টা কখনও করি নাই, আমার হৃদয়ে আমোদের উৎস এত ছিল যে, একথা আমি সজ্ঞানে কখনও স্বপ্নেও মনে আনি নাই, কিন্তু তা হইলে কি হইবে, একজন দুর্দ্দান্ত মাতালকে কে না ভয় করে? লোকে এমন লোককে দেখিলে দূরে সরিয়া যায়। সে তো তাহা পারে নাই, তবু কি সে আমার সেই সময়কার কুৎসিত মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইত ও সেই ভয়ে তাহার অর্দ্ধেক হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায় নাই তাহা কেমন করিয়া ভাবিব? তাই মনে হয়, এখন যাহা পাইলাম তাহা তাহার অর্দ্ধেকটুকু, কিন্তু সেই অর্দ্ধেকটাই নিরাবিল আনন্দজনক হইয়াছিল, কারণ তাহার সহিত ভয় মিশ্রিত ছিল না—একটু সন্দেহের ও অবিশ্বাসের আমেজ মাঝে মাঝে লক্ষ্য না করিয়াছি তা নয়, কিন্তু তাহা দ্বারা সে সময়ে তাহার হৃদয়ের বিকাশ বন্ধ করিতে পারে নাই। এ জীবনে ঐ টুকুই আমার অনন্তমুহূর্ত্তই বল আর সুসময়ই বল, আর পরম লাভই বল—হইয়াছিল। সে সুখের স্মৃতি তাই আজ আমার হৃদয়ে বড়ই আঘাত করিতেছে; কেবল মনে হইতেছে যে আমি হয় তো ইচ্ছা করিলে সেই সুখ চিরস্থায়ী করিতে পারিতাম, কিন্তু যে পাগল সে কি নিজের সুখ দুঃখ বুঝিয়া কাজ করে? সে যে—

প্রবল তমসামেবং প্রায়ঃ শুভেষু হি বৃত্তয়ঃ
স্রজমপি শিরস্যন্ধঃ ক্ষিপ্তাং ধুনোত্যহি শঙ্কয়া॥

আমি সে সময় উপহাস করিয়া তাহাকে "দশমহাবিদ্যা" বলিতাম, তাহাতে সে হাসিয়া উত্তর করিত যে সে এমনি দশমহাবিদ্যা যে তাহার শিবটী ভয় পাওয়া দূরে থাকুক ভয় দেখাইয়া মহাবিদ্যার হাত পা পেটের ভিতর প্রবেশ করাইবার চেষ্টায় ছিলেন। আমার কবিত্ব চেট খেলিয়া বাহির হইত—হাসিয়া বলিতাম কি জান?

কিমপি মনসঃ সম্মোহো মে তদা বলবানভূৎ।

এখন কিন্তু মহাবিদ্যার কৃপায় ভ্রম ভাঙ্গিয়াছে।

স্মৃতি ভিন্নমোহ তমসো দিষ্ট্যা প্রমুখে স্থিতাসি মে সুমুখি।
উপরাগান্তে শশিনঃ সমুপগতা রোহিণী যোগম্॥

তাহার কাছে সংস্কৃত কবিতা আওড়ান আমার একটা সখের মধ্যে ছিল, কারণ ভাবগুলি বুঝিতে তাহার কষ্ট হইত না, সে মূর্খ ছিল না, পিত্রালয়ে ও আমার কাছে লেখাপড়া শিখিয়াছিল, সংস্কৃত বুঝিতে পারিত। এটা আমি কিছু তাহাকে বাড়াইবার জন্য বলিতেছি না, সত্য কথাই বলিতেছি। আমি নিজে সাহেব সাজিতাম, সাহেবী খানা খাইতাম, মদ খাইতাম, চুরুট ফুঁকিতাম, কিন্তু তাহার কোমলতায় কখনও হাত দিই নাই, তাহার বঙ্গবধূত্ব ঘুচাইবার চেষ্টা কখনও করি নাই, তাই ইংরাজী বুকনি না ঝাড়িয়া সংস্কৃত কবিতার ফোয়ারা তাহার কাছে খুলিয়া দিতাম। হাসির তরঙ্গে তাহার হৃদয়ে হাসির সৃষ্টি করিতাম; মনে হইত আমি একটা নূতন মানুষ হইয়াছি। দারুণ গ্রীষ্মের পর তরুকুল যেমন নূতন পত্রের রাশিতে কলেবর ভূষিত করে, আমার শুষ্ক মনটাও যেন সহসা সেইরূপ নব পল্লবিত হইয়া উঠিত।

আমাদের সঙ্গে আনন্দে বিভোর হইত আমার সেই পুরাতন ভৃত্য। তাহার সঙ্গে আমার কোন্ জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক ছিল জানি না, সে আমার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, অবনতিতে ক্ষুব্ধ ও উন্নতিতে তৃপ্ত হইত। এখন মনে হইতেছে যে, তাহাকে ভৃত্য বলিয়া তাচ্ছিল্য না করিয়া যদি তাহার উদার হৃদয়ের কিছু লইতে পারিতাম তাহা হইলে ব্রাহ্মণ সন্তান আমি কৃতার্থ হইতে পারিতাম। ভাল করিয়া বুঝিলে তাহাকে একটা লোক বলিয়া খাতির করা উচিত ছিল, তাহাকে ভৃত্য ভাবিয়া তাহার

হৃদয়ের মহত্ব খর্ব্ব করিয়া দেখিয়া নিজের যে ক্ষতি করিয়াছি, তাহা ভাবিলে এখন কষ্ট হয়। আমরা এখন খুব সভ্য হইয়াছি; বাপ দাদাকে old fool (বুড়া বেকুফ) বলিতে শিখিয়াছি, কুসংস্কার-বাগুরা কটু কটু কাটিয়া ফেলিতেছি, অনেক রকম হৈ চৈ করিতে শিখিতেছি, কিন্তু ঐ বুড়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন বৃদ্ধগুলার মত আমাদের না আছে স্বাস্থ্য, না আছে কর্ত্তব্য জ্ঞান, না আছে তাঁহাদের প্রাণ। বাল্যকালে দেখিয়াছি আমার পিতা পিতামহ ঐ বৃদ্ধ ভৃত্যের সহিত বন্ধুভাবে কথা কহিয়াছেন, তাহার সহিত পরামর্শ করিয়াছেন, সেত আমাদের আপনারই একজনের মধ্যে হইয়া গিয়াছিল। এত দেখিয়া শুনিয়াও কিন্তু আমি তাহাকে শিক্ষা ও পদাভিমানে দূরে রাখিলাম ? তাহাকে আমার হৃদয়ের কাছে আনিতে পারিলাম না, তাহার হৃদয়ের স্নিগ্ধচ্ছায়ায় আত্মপুষ্টি সাধিতে পারিলাম না, আমরা যথার্থই দুর্ভাগ্য ! তাহার কাছ হইতে যদি স্বার্থবর্দ্ধনের মহামন্ত্র শিখিতে পারিতাম তাহা হইলে মানুষ হইতাম, আমার শিক্ষা সফল হইত, হৃদয় স্নিগ্ধ হইত। সেই বিশ্বাসী প্রভুভক্ত ভৃত্য আজ্ ইহ সংসারে নাই ; ইহাই বোধ হয় সুখের হইয়াছে, নচেৎ আজ্ আমার এই দুর্দ্দশায় তাহার কত কষ্ট হইত তাহা ভাবিলেও অস্থির হইতে হয়। যাহা হউক, সে সময়টা যে ইহার মনে একটু সুখ আসিয়াছিল আমার জীবনে ঐ টুকুই লাভ।

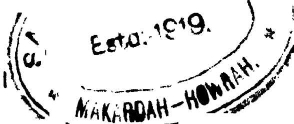
ঘরের কথা আর কত বলিব ? এইবার একটু বাহিরের কথা বলি। আমার পরম শত্রুও বলিতে পারিবে না যে, ভাল অবস্থায় আমার হাসিবার বা হাসাইবার ক্ষমতা ছিল না। তাহার উপর নিমচাঁদের মত ইংরাজী সংস্কৃত বাঙ্গলা কবিতা অনর্গল আওড়াইতে পারিতাম, কথার জোরে সকলকে বশ করিতে পারিতাম। এ গুলা আমার স্বাভাবিক গুণ বলিলেও চলে। এমন লোকতো দেখি না যে আমোদ ভালবাসে না,

তা যে না ভালবাসে, তাহাকে মানুষ বলিতে আমার ঘৃণা হয়। আমি হাসিতে পারিতাম বলিয়া আমার শরীর সর্ব্বদাই সুস্থ থাকিত, অত অত্যাচারেও ভাঙ্গে নাই। মনের সঙ্গে শরীরের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা আমরা ভুলিয়া যাই, যেন মনে হয় যে আমাদের জাতিটাই হাসিতে ভুলিতেছে, তাই জাতীয় স্বাস্থ্যও অবনত হইতেছে। যে প্রাণ ভরিয়া হাসিতে পারে, তাহার অসুখ হয় না। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে হাসাইবার জন্য লোক থাকিত, তাহাদিগকে আদরপূর্ব্বক গোষ্ঠীতে (club) স্থান দেওয়া হইত; বিট পীঠমর্দ্দাদি এই উদ্দেশ্য গঠন করিত। সে দিনও তো বাঙ্গলা দেশে হাস্যরসের চর্চ্চা ছিল, কিন্তু এখন সভ্যতার ধুয়া ধরিয়া আমরা সব আমোদ তুলিয়া দিয়াছি। এখন আমাদের হৃদয়কে যেন সর্ব্বসময়েই মাঘের হিম, তা ফাল্গুনী হাওয়ায় আমাদের কি করিবে? জীবন একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে, হাসির অবসর নাই। মনে স্ফূর্ত্তি নাই। তাই আজ্ কালকার দিনে একজন স্ফূর্ত্তিবাজ লোক পাইলে তাহাকে লুফিয়া লয়। আমার অভ্যর্থনাটা সেই কারণেই বেশ আন্তরিক ভাবেই হইল বলিয়া মনে হয়। আমি তখন মাতাল নই—একটু করিয়া মদ খাই, তা তাতে বড় দোষের বিষয় নাই। বরং সেই রঙ্গিলা চক্ষে সব লাল দেখিতাম, প্রাণে লাজের হিল্লোল খেলিত; মুখে অবিশ্রান্ত রঙ্গদার সরস বচনাবলী বাহির হইত। সকলে সেই আনন্দের তরঙ্গে গা ভাসাইয়া দিত।

কেহ কেহ আমায় বলিত "তোমার তো সব ভাল, ঐ মদ খাওয়াটাই তোমার দোষ—ওটা খাও কেন?" আমি হাসিয়া জবাব দিতাম, "Because the best of life is intoxication (কারণ মত্ততাই জীবনের সার)। যদি না মাতিতে পার তাহা হইলে তুমি কিছুতেই কিছু করিতে পারিবে না। মদ না খাইয়া

আমাদের দেশটা উচ্ছন্ন গেল—দেশ হইতে আনন্দ উঠিয়া যাইতেছে তা কি দেখিতেছ ভায়া? তাই বলি "সুধা খাই মা কালী বলে;" মদে যদি আমায় না খায় তা হ'লে আর দোষটা কি? আর আগে তো আমাদের দেশে সকলেই মদ খাইত; একাগ্রতার জন্য—স্ফূর্ত্তির জন্য; তা তো জান। দেবতারাও সোমরসের লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেন না, সোম পানের লোভে যজ্ঞাগারে নামিয়া আসিতেন—কবি বলিয়াছেন "কি মশ্বিনৌ সোমরসং পিপাসূ।" যদি জগৎটাকে নিতান্ত শাদা দেখিতে না চাও তো একটু "অাঁখিয়া লালি" কর, নইলে জগতের মজা বুঝিতে পারিবে না। জানই তো তোমাদের চরক সুশ্রুত সুরা পানের ব্যবস্থা করিয়াছেন. শুধু রোগ নিবারণের জন্য নয়, আনন্দের জন্য—আর অমর কবি লিখিয়াছেন :—

"গলিতভি ভ্রম বন্ধ বিচক্ষণং
সুরভি গন্ধ পরাজিত কেশরম্।
পতিষু নির্বিবিশুর্মধু.মসনাঃ
স্মর সখং রস খণ্ডন বর্জ্জিতম্



যদি কুললক্ষ্মীদের মধুসেবনে দোষ হইত না, আমরা খাইলেই দোষ? আগে প্রত্যেক গৃহস্থের বন্ধুদিগকে আহ্বান করিয়া একসঙ্গে মদ্যপান করিবার ব্যবস্থা ছিল—আমোদের জন্য; কোল ভীলের মত মাতলামি করিবার জন্য নহে। প্রতিগৃহে একটী করিয়া পাকভূমি রাখিতে হইত। যাহাকে আপন বলিত। কালিদাসই তো বলিয়া গিয়াছেন :—

"যত্র স্ফটিকহর্ম্মেষু নক্ত মাপান ভূমিষু।" ইত্যাদি।

তা ভাই আমার কথা শোন, কালিদাস নিশ্চয়ই ঐ Cup that cheers but not inibriates এর ভক্ত ছিলেন, নচেৎ কি সাদা চ'খে লতিকার

মলয় নৃত্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। তোমাদের moral lecture (নৈতিক বক্তৃতা) শিকেয় তুলে রাখ, একটু করিয়া সুধা পান কর। প্রয়তত্ত্ব তো শিখিলে না, জীবনটা নীরস করিয়া ফেলিলে। তোমাদের প্রাণটা ফ্যাকাসে হইয়া যাইতেছে "পুরাণশীধু"র আশ্রয় লও তবেই তোমাদের উপায় হইবে। অন্ততঃ এখন lecture ছাড়িয়া "পিয়ালা মুখে ভরি দেরে।"

তাহারা সব লাঙ্গুলহীন শৃগাল বলিয়া আমাকে ঠাট্টা করিত, কিন্তু আমাকে দমাইতে পারিত না; আমার মুখের সামনে কেহই টিকিতে পারিত না। আমার যুক্তি অকাট্য। ভিতর হইতে যখন আনন্দের উদ্দীপনা নাই, তখন বাহির হইতে উহা লওয়া চাই, পরিমিত পানে শরীরের ও মনের উপকার বৈ অপকার হয় না কে একথা অগ্রাহ্য করিবে? তবু তাহারা যে হৃদয়ের যুক্তি শুনিত তাহাতেই তাহাদের জিত, আমার মাথার যুক্তির হার হইত, তখন সে সব কথা হৃদয়ঙ্গম না হইলেও এখন তাহা হইতেছে। তখন যদি সে কথায় কাণ দিতাম তাহা হইলে আমার এমন পতন হইত না, এখন দুরবস্থা হইত না। মদ খাওয়ার কত অপকার তাহা স্বচক্ষে অনেক দেখিয়াছি, না দেখিলেও অনেক শুনিয়াছি, তথাপি চেতনা হইল না। তথাপি আকণ্ঠ বিষ পানে প্রবৃত্ত রহিলাম। অদৃষ্ট!

আমি যে সহরে প্র্যাক্‌টিস আরম্ভ করিয়াছিলাম সে সহরটী একটী জেলার হেড কোয়াটারস্ অর্থাৎ প্রধান স্থান। সহরটী যে বড় তাহা নহে, তবে সুবিধা এই যে কাজকর্ম্ম সেখানে মন্দ নয় এবং রেলের ধারে। কলির রাজধানী কলিকাতায় যাওয়া আমার বেশ সুবিধা ছিল; প্রায়ই আমি এটা ওটা সেইটার অছিলায় কলিকাতা যাইতাম। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থল কলিকাতা কাহাকে না আকর্ষণ করে? অন্ততঃ আমার

চক্ষে ইহার নানাবিধ আকর্ষণী শক্তি প্রকাশিত হইত, আমি সে আকর্ষণ এড়াইতে পারিতাম না। যে যথার্থ জ্ঞানের পথিক তাহার যেমন কলিকাতা না হইলে চলে না, তেমনি যে অন্ধ তমসায় প্রবেশ করিতে যায় তাহারও কলিকাতা না হইলে জুত হয় না। আমার মত যে ভাল রকম সাহেব সাজিতে চায়, ভাল মদ খাইতে চায়, ভাল খানা খাইতে চায়, আর ভাল—যাক্ সে কথায় আজ্ আর এখন কাজ নাই, ফলে কলিকাতায় আমার একটা না একটা প্রয়োজন লাগিয়াই ছিল। উৎসন্ন হইবার পন্থা সেখানে যেমন সুলভ, তেমন আর কোথায় পাওয়া যায় বল ?

যেখানে ওকালতি করিতেছিলাম সে স্থানটীর আদিম নিবাসীরা কোল, বাউরি ইত্যাদি নীচ জাতি। তাহারা কাজকর্ম্ম করে, রাত্রে মদ খায় ও স্ত্রী পুরুষে মিলিয়া নাচ গান করিয়া দিব্য আনন্দে কাল কাটায়। আর যখন খুব নেশা হয় তখন বকাবকি করে, মারামারি করে, মাথা ফাটাফাটি করে ; মানুষের জীবনের মূল্য ইহারা জানেই না। সামান্য কোনও কারণে লাঠি মারিয়া অন্য কাহাকেও মারিয়া ফেলিতে তাহাদের একেবারেই বাধে না ; তাহার পর একটা মানুষ খুন হইল তার জন্য মনে যে একটা বিষম অনুশোচনা তাহাও বড় আসে না, তবে অপরাধ গোপন করিবার বিশেষ চেষ্টাও করে না। যদি ধরা পড়িল তো সোজাসুজি বলিয়া দিল "হঁ আম্মা মারেই দিলি।" কোনও নিদারুণ প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যে একটা রীতিমত কৌশলময় হত্যা ব্যাপার তাহা এখানে নাই বলিলেই চলে, ও সব সভ্য দেশের আমদানী, কলিকাতার মত বড় জায়গায় আজ্‌কাল হইতেছে, এখানে সাধাসিধে খুন—সাধাসিধে মোকদ্দমা—সাধাসিধে ফাঁসি। সত্য কথা বলিতে কি, এখানে মোকদ্দমা করিয়া যেন সুখ পাওয়া যায় না, প্রতিভার বিকাশের যেন কোনও অবকাশই পাওয়া যায় না। রহস্য না পাইলে কি লইয়া মাথা ফাটাইব ?

কিন্তু তাহাতে বড় আসে যায় না, কারণ ইহারা পয়সা দিতে জানে, উকীলকে ফাঁকি দিবার বিদ্যাটা এখনও ইহারা ততটা আয়ত্ত করিতে পারে নাই, তবে যে নিতান্ত গরীব তাহার কথা ভিন্ন, পারতপক্ষে কেহই উকীলকে ঠকাইতে শিখে নাই। ঐটাই আমাদের লাভ।

আর একটা কথা এই খানে বলিয়া রাখি—আমার মনে এই অসভ্য নিরঙ্কুশ ব্যক্তিদিগের প্রতি কেমন একটা টান আসিয়াছিল। যখন ইহাদের নৃত্যগীত দেখিতাম শুনিতাম, তখন বেশ বুঝিতে পারিতাম যে ইহাদের মন যেন জলের মত শাদা, নৃত্য-গীতে ইহাদের শরীরে যে "কোলাহল" উপস্থিত হয়, তাহা দেখিতে অতি সুন্দর, তাল মান সূক্ষ্ম ভাবে খুঁজিয়া না পাওয়া গেলেও ইহাদের নামে একটা সুন্দর শৃঙ্খলা আছে, গানে বেশ সমস্বরত্ব আছে, ধুয়ায় একটা অর্থহীন আনন্দোচ্ছ্বাস আছে, যাহা দ্বারা কেবল তাহাদেরই আনন্দ হয়, তাহা নহে, দর্শকদের মনেও একটা আমোদের কল্লোল আনিয়া দেয়। যাহারা পল্লীগ্রামে বাস করে তাহারা আরও সরল এবং যতদূর জানিতে পারিয়াছিলাম, নৈতিক চরিত্রেও বেশ পরিপুষ্ট। ইহারা নাচে গায়, আমোদ করে, তবে পশুজীবন যাপন করে না, ইহাদের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে চরিত্রক্ষুণ্ণ করিবার কথা থাকিলেও বিবাহের পর স্ত্রী পুরুষে প্রায়ই দাম্পত্য—সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখে। প্রত্নতত্ত্ব হয় তো বলিবে যে স্ত্রীকে বিষয়ের সামিল মনে করে বলিয়াই স্ত্রীর সতীত্ব বজায় রাখিবার জন্য ইহাদের এত প্রযত্ন ; আবার কেহ হয় তো বলিবেন তাহা কেন বাঁদর অবস্থা হইতেই মনুষ্য জাতির এক বিবাহই (mono game) স্বাভাবিক, একনিষ্ঠতাই স্ত্রী পুরুষের স্বাভাবিক ভাব। যে কারণেই হউক, ইহাদের মধ্যে এমনি ঘটে। সহরে কিন্তু ইহার বিপর্য্যয় দেখা যায়। সহরের কাছে থাকিয়া সভ্য মানুষের সংসর্গে আসিয়া এই বন্য জাতির বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে ; ইহারা

শঠতা প্রবঞ্চনা শিখিতেছে, বাবুয়ানির দিকে দৃষ্টি দিতেছে, আর ইহাদের স্ত্রীলোকদের চরিত্র যথেষ্ট পরিমাণে নষ্ট হইতেছে। সেটা আমি বেশ জানিতে পারিয়াছি।

কে জানে কেন—আমার মনটা ইহাদের দিকে কিছু অধিক মাত্রায় ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল; যেন ইহাদের সঙ্গকামনা ক্রমশঃ আমার হৃদয়ে প্রবল হইতেছিল। ইহাদের আমোদ-প্রবণতা আমার মনে জোরে ধাক্কা দিতে লাগিল, কেবলই মনে হইত জগতে তো ইহারাই সুখী; ইহাদের মত সুখে জীবন কাটানই জীবন ধারণের সার্থকতা। "শকুনি যত উঁচুতেই উড়ুক, তাহার নজর থাকে গো-ভাগাড়ের উপর" আমারও তাহাই হইল। আমি ব্রাহ্মণ সন্তান, শিক্ষাভিমানী, সেক্ষপীয়র, মিল্‌টন, সেলি, বায়রণ, কালিদাস আমার কণ্ঠাগ্রে বিরাজিত, আমার রসনায় ক্ষুরাগ্রধার, আমার মেধায় সকলে মুগ্ধ, সেই আমি এই নীচ অন্ত্যজ জাতির সঙ্গ-কামনায় লালায়িত। কেহ বলিতে পারেন কি—এ কেন হয়? সাম্য মৈত্রী? মিছে কথা, আমার মনে সাম্য মৈত্রী ছিল না। আমি নিজেকে অন্য লোকের অপেক্ষা উচ্চই ভাবিতাম। নিজের বুদ্ধি, নিজের শিক্ষার বিশেষ গৌরব করিতাম। মনে মনে জানিতাম ইহারা কোথায়, আর আমিই বা কোথায়? তথাপি, এই আসঙ্গলিপ্সা কোথা হইতে আসিল? এবং ভবিষ্যতে সেই আসঙ্গলিপ্সা আমায় কোথায় টানিয়া লইয়া গিয়াছিল — তাহাতে কি ফল হইল, তাহা পরে বলিব। আপাততঃ সেই প্রবৃত্তি তাহাদের নৃত্যগীত দর্শন শ্রবণ পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিল। আমার সে সময়কার মানসিক অবস্থা ও চক্ষুলর্জ্জা ইহার বেশী হইতে দেয় নাই; নাচগান দেখিতাম আর আনন্দে মাতিয়া উঠিতাম, তাহাদিগকে কখনও নিজ বাটীতে আনাইয়া নাচ দেখিতাম, কখনও তাহাদের

আখড়ায় গিয়া নাচ দেখিতাম, যখনই দেখিতাম তখনই তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতাম। অধিকাংশ সময়ে পুরস্কার দিয়া, কখনও বা বাচনিক প্রশংসা দ্বারা। তাহারা বুঝিয়াছিল আমি তাহাদের পক্ষপাতী, অতএব তাহারাও আমার অনুগত হইয়াছিল।

আমার স্ত্রী অবশ্য এ কথা বুঝিতে পারে নাই যে, আমার মনে ঐ নীচ জাতির সহিত আত্মীয়তা স্থাপনের একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইতেছিল; সে মনে করিত আমার স্বাভাবিক আমোদ প্রিয়-তারই বশবর্ত্তী হইয়া আমি উহাদিগকে প্রশ্রয় দিতেছি। সেও যে ইহাদের নৃত্য কলা উপভোগ না করিত তাহা নহে, তবে সে এখন আর নববধূটী তো নাই, সে গৃহিণী, কাজেই এই ব্যাপার লইয়া খরচের বাড়া-বাড়িতে সে বিরক্ত হইত তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিল। আমি কিন্তু টাকা-টাকে খোলামকুচি ভাবিয়াই খরচ করিতাম; আমার মনে হইত টাকা কেবল উপভোগের সরঞ্জামের সরবরাহ করিবার জন্যই, তাই উপভোগের জন্য যা টাকা খরচ তাহাকে আমি বাজেখরচ বলিয়া ভাবিতে পারিতাম না। এইরূপে আমার জীবনে শনি ও লক্ষ্মীর বিবাদ চিরকালই চলিয়া-ছিল—এখন বলিয়া নয়। বড় অক্ষরে লিখিয়া রাখি ইহা আমার অদৃষ্ট। অদৃষ্ট মানিতাম, কারণ বিলাতী মতেও অদৃষ্ট (fate) মানা চলে, মানিতাম না অদৃষ্ট বিধাতাকে, আর এই অদৃষ্টের কারণকে। মানুষ যেমন ভাবে, বিশেষতঃ ইউরোপের মানুষ যেমন ভাবে, আমিও তাহাই ভাবিতাম, আমিই কর্ত্তা; আমার কাজের পশ্চাতে যে আরও কোনও একটা প্রবল কারণ আছে সেইটুকু মানিতে শিখি নাই—বুঝিতেও পারিতাম না।

যাহা হউক, সে সময়ে অর্থের অনাটন ছিল না, সেই কারণে এরূপ অপব্যয় অপ্রিয় হইলেও আমার চিত্তবিনোদনে কৃত সংকল্পা গৃহিণী সে

কথা লইয়া আমাকে বেশী বিরক্ত করিত না, আমারও চেতনা হইত না। আপদ যখন আসে তখন হিতকে অবলম্বন করিয়াও অলক্ষ্যে আসিয়া পড়ে, আমারও হিতে বিপরীত ফলই দাঁড়াইল।

এই রকম মাঝামাঝি অবস্থায় দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ভাল অবস্থায় আমি কয়েক বৎসর কাটাইতে পারিয়াছিলাম। এখন ভাবি যে কেমন করিয়া তাহা হইল এবং আরও ভাবি যে, অতদিন ভাল ভাবে কাটাইয়া আবার এমন পতনই বা কেমন করিয়া হইল? ইতিমধ্যে পিতৃ পিতামহের পুণ্যফল স্বরূপ তাঁহাদের জলগণ্ডুষ দিবার লোক বাড়িয়া গেল। আমি তো ও পাট তুলিয়া দিয়াছিলাম আমি যে হালী সভ্যবাবু। Ancestor worship (পূর্ব্বপুরুষের পূজা) যে অসভ্যদিগের চিহ্ন!

ইহারই ভিতর কেমন করিয়া কবে কুপ্রবৃত্তির স্রোত বহিয়া আমাকে নীচের দিকে টানিয়া লইয়া গেল তাহাই এইবার বলিব। বলিয়াছি যে— আমার প্রাণটা সর্ব্বদাই অবাধ আনন্দের দিকে ছুটিতে চাহিত। ঐ অসভ্যগুলাকে আমি যখনই দেখিতাম তখনই আমার মনে এই চিন্তার উদয় হইত যে আমাদের অপেক্ষা ইহারা কিসে মন্দ? আমরাই বা সাধারণতঃ ইহাদের চেয়ে কোন্ অংশে ভাল জীবন যাপন করি তাহা তো বুঝিতে পারিতাম না। কেবল টাকা টাকা করিয়া এবং তাস পাশা-দাবা খেলিয়াইতো আমাদের জীবন কাটিয়া যাইতেছে, ইহারা না হয় একটু বেশী আমোদ করে, একটু মদ খায়—একটু নাচ গান করে, তাতো অনেক সুসভ্য জাতিও করিয়া থাকে, তবে ইহাদের আমরা এত ঘৃণাই বা করি কেন? আমরাই কোন্ বড় বড় কাজ করিয়া বেড়াইতেছি? আমরা জানি কেবল সকল বিষয়ে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে এবং "ছোট লোক" আর "ভদ্র লোক" বিচার করিতে। যথার্থ কথা

বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, আমরা ছোট লোক বলিয়া যাহাদের ঘৃণা করি, তাহাদের ভিতর এত উচ্চ হৃদয়ের লোক পাওয়া যায় যে দেখিলে নয়ন সার্থক হয়। আমি এই ছোটদের ভিতর এমন সব লোক দেখিয়াছি যে, তাহাদের কাছ হইতে আমাদের শিখিবার অনেক জিনিষ আছে, আমরা একটা বৃথা দম্ভের কবলে পড়িয়া তাহাদিগকে শিক্ষক পদে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া তাহাদের শিক্ষক হইতে যাই। আমি একটী লোককে জানিতাম যে অতি নীচ কুলে জন্মিয়াছিল, সে ছিল জাতিতে মালী, কিন্তু কি তাহার মহত্ত্ব! তাহাকে দেখিতে ঠিক রবি বাবুর "পুরাতন ভৃত্যের" মত অর্থাৎ "ভূতের মতন" সে কখনও মলিন ভিন্ন বস্ত্র পরিত না; দেখিলে ঘৃণা হইত। কিন্তু বলিব কি, তাহার পদস্পর্শ করিলে বোধ হয় আমাদের মত শিক্ষিত যুক্তিসর্ব্বস্ব (Rationalistic) বাবুদের দেহ মন পবিত্র হওয়ার অনেক সম্ভাবনা ছিল। তাহাকে লোকে ঠাট্টা করিয়া পাগল গোঁসাই বলিত; সে অনেক টিকিধারী ফোঁটা-কাটা গোঁসাই প্রভুর চেয়ে ভাল ছিল। কেন জান? তাহার ষড়্‌রিপুর কোনওটাই ছিল কিনা সন্দেহ। কখনও তাহার লোভ দেখি নাই, স্ত্রীলোক দেখিলে সে "মা" ভিন্ন আর কোনও সম্বোধন করিত না, তা সে রাজরাণীই হউক বা মেথরাণীই হউক। একবার তাহার ঐ ভূতের মত চেহারা দেখিয়া অসভ্যগুলাও "ছেলেধরা" ভাবিয়া বেশ উত্তম মধ্যম দিয়াছিল, তাহাতে সে ক্ষত বিক্ষত শরীরে যখন ফিরিয়া আসিল, তখনও তাহার মুখে রাগের কথা একটীও শুনিতে পাইলাম না, "বড় কঠিন করেছে" এ ভিন্ন একটীও গালি তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। কেহ যদি তাহাকে কোনও ভাল জিনিষ দিত, তাহা হইলে সে হয় নিজে তাহা আর কাহাকেও দিয়া আসিত অথবা অন্যে তাহা লইয়া যাইত তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপও ছিল না। সে সকলের

গেলাম—মদ মাৎসর্য্যের চিহ্নও তাহার ছিল না, নিজের মনে নিজের স্বেচ্ছা-গৃহীত অবৈতনিক কার্য্য করিয়া যাইত, তাহার উপর সকলের ফাইফরমাস খাটিত, মুখে কখনও টুঁ শব্দ করিত না। তাহার ঘর ছিল, স্ত্রী পুত্র ছিল, কিন্তু সে ঐ নিজের বাছা হীন কাজ ফেলিয়া তাহাদেরও সংবাদ লইতে যাইত না; তাহার মুখে ভগবানের নাম লাগিয়াই ছিল, এবং প্রাতঃকালে যেখান হইতেই হউক কিছু ফুল সংগ্রহ করিয়া একটা মালা গাঁথিয়া মন্দিরে দেববিগ্রহকে নিবেদন করিয়া দেওয়া তাহার একটী নিত্যকর্ম্মের মধ্যে ছিল। তাহার মুখ হইতে যে জ্ঞানের কথা বাহির হইত, তাহা, জ্ঞানাভিমানী অজ্ঞান আমরা, কখনও মনের সহিত ধরিতে পারিলাম না ইহাই আমার শেষ জীবনের দুঃখের বিষয়! কাজ করিয়া সে কখনও পয়সা লয় নাই, পয়সা দিলে হয় কোনও গরীব দুঃখীকে দিয়া ফেলিত, নয় কেহ তাহা অপহরণ করিত, সে দৃক্‌পাতও করিত না। বল দেখি ভাই আমরা ইহার চেয়ে কোন্‌খানটায় ভাল?

ভাল বৈকি! ভাল না হইলে আমরা চৈতন্যকে পাগল বলি, বুদ্ধকে কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন বলি, শ্রীরামকে নাটক লিখিয়া চুণকাম করিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হই! আমরা গড়িতে পারি বা না পারি ভাঙ্গিবার জন্য ব্যস্ত,—তা নিজের জীবন পর্য্যন্ত। কেমন করিয়া ঐ কার্য্যটী করিতে হয় জানিতে চাও তো আমার কথা শোন। আজ স্পষ্ট দেখিতেছি যে কোথায় আমি হীন লম্পট মাতাল, আর কোথাই বা সে ইন্দ্রিয়-বিজয়ী মহাপুরুষ—সে হইল নীচ আর আমি কিনা নিজেকে শিক্ষিত বলিয়া গর্ব্ব করিতাম।

যাক সেকথা, এখন আমার জীবন নাটকের এই সুখময় অঙ্কে কেমন করিয়া যবনিকা পড়িল এইবার সেই কথা বলিব।

সতীশের কথা।

সুনীলা গাহিতেছিল—

"নীরভরণে কৈ সে যাউ স্বজনি!"

তাহার গলা যেন সারঙ্গের সহিত মিশিয়া গিয়া একটা অপূর্ব্ব মোহের সৃষ্টি করিতেছিল; তাহার হাবভাব, তাহার মধুর লাস্য যেন একটা নিবিড় আনন্দের সৃষ্টি করিতেছিল। সুনীলা কলিকাতা সহরের প্রসিদ্ধ গায়িকা ও নর্ত্তকী; সুনীলা বাই বলিতে কলিকাতার বাবুদের "নোলা সক্‌সক্‌" করিয়া উঠে। তাহার রূপ আছে, যৌবন আছে, তাহার উপর সুস্বর নৃত্য-পটুতা বিলক্ষণ আছে, কাজেই বাবুদের মহলে তাহার আদরও যথেষ্ট। এ হেন সুনীলা আজ্‌ আসর জমাইয়া গান ধরিয়াছে, বাবুদের মাথানাড়ার ধূমও যত—তালে বেতালে বাহবা বাহবা বলিবার ধূমও তত। বাবুরা তালতলা দিয়া যান না, তাহাতে ভাবের নাকি ক্ষতি হয়। কিন্তু হাম্বারবে গানের প্রশংসা না করিলেও তাঁহাদের প্রাণের পিপাসা মেটে না। একজন ওস্তাদ, কোনও একটী বাবু বেতালে বাহবা দেওয়াতে, তাহাকে বলিয়াছিল যে "ক্যা বাহ্‌, তুমারা দারি বাহ্‌, কি হমারা মোচ বাহ্‌," এ ক্ষেত্রেও বাহবাটা ঐ ধরণেরই হইতেছিল। তবে আজিকার যে মজ্‌লিস্‌ সেখানে সমজ্‌দারের স্থল নাই, কেবল ফ‌্র্ত্তির মহলা, কাজে কাজেই কেইবা সে বাহ্‌বা তালে কি বেতালে পড়িতেছে তাহা লক্ষ্য করে?

কলিকাতার "বাগান" যে কি বস্তু তাহা কি কেহ দেখিয়াছেন? না দেখিলে ইহার ঠিক ধারণা করা কঠিন। "বাগান" অর্থাৎ ইংরাজী গার্ডেনপার্টি"র রূপান্তর; কিন্তু ইংরাজী গার্ডেনপার্টিতে এমন বীভৎস কাণ্ড ঘটে কি? কলিকাতার ধনীদের "বাগান" একটা বিষম নেশার মধ্যে; ইহা তাঁহাদের একটা বড়ই আমোদ। আমি আজ্ কলিকাতার সেই বাগানে উপস্থিত। বাগানটী সুন্দর, সুরম্য অট্টালিকার ক্রোড়লগ্ন, ছবির মত দেখিতে। যে বাবু "বাগান"টী দিতেছেন এ উদ্যানটী তাঁহারই ভাড়া করা নয়; অধিকাংশ স্থলে ভাড়া-করা বাগানেই আমোদের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, এ ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। যাহার নিজস্ব বাগান বাড়ী আছে তাহার টাকাও যথেষ্ট আছে, এটা সম্ভব, অন্ততঃ সে অবিমৃশ্যভাবে পয়সা খরচ করিয়া আনন্দোৎসবের আয়োজন করিবে, ইহা হওয়াই স্বাভাবিক। এ অনুষ্ঠানে তাহাই হইয়াছিল। আয়োজন প্রচুর সর্ব্ববিষয়েই। কোথাও কালোয়াতি গান, কোথাও বাদ্য কন্সার্ট, কোথাও বাইনাচ আর গান। খাদ্য ত্রিবিধ—দেশী, বিলাতী, মোগলাই। মদ্য নানাবিধ, যে যাহা চায়, যে যাহা খায়। প্রসিদ্ধ উদ্যানের ভূমি "চাইনিজ ল্যাণ্টার্ণে" সুশোভিত, অট্টালিকা সুশোভিত, নানাপ্রকার আলোকমালায় সুসজ্জিত। অভ্যাগত ভদ্রলোকেরা কেহ এক রকম, কেহ অন্য রকম, কেহ তাস পাসা, কেহ দাবা, কেহ গান নাচ, এবম্বিধ বহুবিধ আমোদে মগ্ন। এ হেন ধূমের "বাগানে" কলিকাতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাইজী সুনীলা বাই আসিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার পরই সুনীলার নাচ গান আরম্ভ হইল। বাবুর দল যেন সকল আমোদ উপেক্ষা করিয়া ইহার চারিদিকে ভ্রমরের মত গুণ গুণ করিতে লাগিলেন। তা সেটা বড় বিস্ময়ের কথা নহে—এই সুনীল কলা-শিল্পে গণনীয়া, রূপে

অতুলনীয়া, ঢংঢাংতে নিপুণা, কথাবার্ত্তায় চতুরা, সর্ব্বতোভাবে "বাবু" মনোমোহিনী।

যদি সঙ্গীত নৃত্যাদির অনুশীলন ও তজ্জনিত আমোদ উপভোগ করিয়াই "বাগান" সমাপ্ত হয়, তাহা হইলে উহা বোধ হয় আনন্দের ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইলেও হইতে পারিত। বাগানে অনেকেই আসেন। যাঁহারা একটু আমোদ উপভোগ করিতেই আসেন, তাঁহারা সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া সারিয়া, অল্পক্ষণ গীতবাদ্য শুনিয়া, ফিরিয়া যান। বাকী যাহারা থাকে, তাহারা যে কিসের লোভে থাকে, তাহা বোধ হয়, জানাইতে হইবে না। ইহারা থাকে—এই আমার মতন যাহারা—তাহারা থাকে মদ খাইবার জন্য এবং নরক গুলজার করিবার জন্য। ক্রমে ক্রমে মদের মাত্রা বাড়িতে থাকে, ঢলাঢলির চূড়ান্ত হইতে থাকে। কোথায় থাকে গান, কোথায় থাকে শিল্পকলার আনন্দ; সকলেই মদ ও তাহার আনুষঙ্গিক বস্তু লইয়াই মত্ত হইয়া পড়ে। অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়ায় যে, সামান্যা গণিকাও ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে বাধ্য হয়। তাহাকে বা তাহাদের আদর যত্ন করিবার প্রলোভনে, অথবা এ কথা বলিলেই ভাল হয় যে, মদ্যপানজাত কাণ্ডজ্ঞান-হীনতার প্রভাবে, তাহার প্রতি যত্ন নামধেয় অত্যাচারের বীভৎস লীলা আরম্ভ হয়। বিষম গণ্ডগোলে সকলের "কাণ ঝালা পালা প্রাণ পালা পালা" হইয়া উঠে। কেবা গান শুনে, নাচ দেখে, কেই বা সযত্ন-সঞ্চিত সুখাদ্য রাশির মর্ম্ম বুঝে। তার পর আরও যে সকল কাণ্ড ঘটে, তাহা আর বলিয়া প্রকাশ করিবার উপায় নাই। ইহারই নাম কলিকাতার "বাগান," ইহাতেই কত প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়া যায়, ইহার জন্যই বাবুদের কত উৎসাহ, কত উদ্যম, কত আগ্রহ! ছি! আমরা আবার সভ্যতার ও নৈতিক উন্নতির বড়াই করি।

যাক্ এখন নিজের কথা বলি। কোন্ কুক্ষণে এবার কলিকাতায় আসিয়াছিলাম জানি না, আমি এই বাগানের নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলাম। যখন আসিলাম, তখন আমার মনে একটু ফূর্ত্তি করা ভিন্ন আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। প্রথম সন্ধ্যায় যখন বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন যথার্থই প্রাণে বড় একটা উল্লাসের তুফান উঠিল। অতি সুরম্য স্থল এই বাগানটী—গঙ্গার ধারে অবস্থিত। কত ফুল—বেলা চামেলী রজনীগন্ধা প্রভৃতি—ফুটিয়া উঠিয়া যেন চতুর্দ্দিক্ গন্ধে আমোদিত করিতেছে। কোথাও বা ভাল ভাল বিলাতী ফুল—দেখিতে বড়ই সুন্দর—কিন্তু "তুনোতি নির্গন্ধ তয়া স্ম চেতঃ"। অদূরে সন্ধ্যার নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়া নদীর কলনিনাদ অশ্রান্ত গানের মত কাণের কাছে বাজিয়া উঠিতেছে। উপরে—নীল আকাশের গায়ে—প্রকৃতি সুন্দরী যেন বহুবর্ণ বিচিত্র কত ছবিই আঁকিয়া রাখিয়াছে। ইহা পাথর-চাপা কলিকাতা! বাহিরে এই উন্মুক্ত প্রকৃতির দৃশ্য বড় মনোরম। আমার পক্ষে এমন দৃশ্য কিছু নূতন নয়—আমি যেখানে থাকি সেখানে এমনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সর্ব্বদাই দেখা যায়; কিন্তু কলিকাতার ধূমাচ্ছন্ন নিঃশ্বাস-রোধক কোন কোলাহলময় জনতা হইতে বাহিরে আসিয়া প্রাণে একটা যেন স্বচ্ছন্দতার অনুভব করিতে লাগিলাম। প্রাণে ভরা সুর তুলিবার সকল উপাদানই তো এখানে রহিয়াছে। তোমরা হয়তো বিশ্বাস করিবে না—তথাপি বলিয়া রাখি, যে, আমার তখনও কবির প্রাণ ছিল, কবিত্বের জীবনের যে সেই দিন গঙ্গার যোগাড় হইতেছিল, তাহা তখনও তো বুঝিতে পারি নাই। কবিত্বের প্রাণ বলিলাম বলিয়া কেহ উপহাস করিও না, মাতালের কি কবিত্ব থাকিতে পারে না? অন্ততঃ কোনও বাঙ্গালী এ কথা বলিতে সাহস করিবেন না, কারণ তাঁহাদের বড় সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই

বোতল-বাহিণীর সেবক ছিলেন। আমার প্রাণেও সেইক্ষণে কবিত্বের বুদ্‌বুদ্‌ উঠিতেছিল, সে কথা বলিলে এমন কিছু একটা পৃথিবীর দশম আশ্চর্য্যের বিষয় অবতারণা করা হয় না, যে, তাহা একেবারে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে। "লজ্জা-নম্র নব বধূ সম" সন্ধ্যা যখন আকাশের গায়ে মসী মাখাইয়া প্রকৃতির মুখে অবগুণ্ঠন টানিয়া দেয়, সে দৃশ্য যে দেখিতে জানে তাহার কাছে বড় মনোরম। প্রকৃতির কণ্ঠে পুরবী রাগিণীর আলাপ যেন আপনা আপনি ফুটিয়া উঠে, যাহার কবিত্বময় শ্রবণ আছে সে তাহা শুনিতে পায়। নিস্তব্ধতা, নির্জ্জনতা না থাকিলে তাহা শুনিবার উপায় নাই, কাজেই কলিকাতার লোক তাহা কখনই শুনিতে পায় না, সেখানে নিস্তব্ধতাও নাই, নির্জ্জনতাও নাই, উন্মুক্ত আকাশ নাই, গন্ধবহ মৃদু সমীরণও নাই। আমার এখন পার্ব্বত্যপ্রদেশে থাকিয়া থাকিয়া হৃদয়ের মধ্যে প্রকৃতির অসংবৃত সৌন্দর্য্যের একটা ছাপ পড়িয়াছিল, তাই কলিকাতায় যে উদ্দেশ্যেই আসি, প্রাণটা মাঝে মাঝে হাঁপাইয়া উঠিত; কৃত্রিম উপায়ে কৃত্রিম আমোদে প্রাকৃতিক স্বাধীনতার অভাব মোচন হইত না। তাই আজ্‌ এই উদ্যানে আসিয়া প্রথমে বড়ই আনন্দ পাইয়াছিলাম। স্ফূর্তিবাজ লোক আমি—প্রথমে আসিয়াই যেন মনের মধ্যে অনেক খানি স্ফূর্ত্তির সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলাম। যদি আনন্দকে সংযত করিতে জানিতাম, তাহা হইলে সে দিন না জানি, কত আনন্দই উপভোগ করিতে পারিতাম। কিন্তু ঐ জিনিষটী কখনও শিখি নাই, শিখিবার চেষ্টাও করি নাই। আমাদের জীবনটা উচ্ছৃঙ্খলতাতেই পর্য্যবসিত হইল। যাহাদের নকল করিয়া আসল ফেলিয়া দিলাম তাহাদেরও বুঝিলাম না, দেশের কথা তো বুঝিলামই না। উহাদের কাছ হইতে কাজ শিখিলাম না, দেশের কাছ হইতে ত্যাগও শিখিলাম

না। উহাদের কাছ হইতে লইলাম—গণিকাকে প্রশ্রয় দান, যেটা দেশের পক্ষে গৌরবের কথা নয়। উহাদের মদ্যপানে সংযম রাখিতে হয়, নানা কারণে সেটা বাদ দিলাম। আমাদের দেশে গণিকার আদর ছিল আমোদের জন্য, শিল্পানুশীলনের জন্য সেটাও বাদ দিলাম। দাড়াইল হেকেটের কটাহপক্ক বীভৎস ব্যঞ্জন। সে ব্যঞ্জন যাহার উদরস্থ হইয়াছে, তাহার আর কি রক্ষা আছে? সে ব্যঞ্জনের ঝাঁজে কোথায় রহিল কবিত্ব, আর কোথায় রহিল নীতি।

আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বাসের সময় সুনীলার গান শুনিতে বসিলাম। বড় মিষ্ট লাগিতেছিল, সুনীলা গায় ভাল। তাহার সুকণ্ঠ নৈসর্গিক নৈশ সঙ্গীতের উপরে উঠিয়া শ্রোতৃবর্গের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিতেছিল। স্ত্রী-কণ্ঠের মধুমাখা গান কে না ভালবাসে? কিন্তু সে আমোদ তো আমাদের সমাজে নির্দ্দোষ ভাবে পাইবার উপায় নাই। তাহা পাইবার উপায় থাকিলে সহজে এই "বাগানের" প্রয়োজন থাকিত না। কে জানে কবে এবং কি কারণে সমাজ হইতে গৃহস্থ কন্যার ও গৃহস্থ বধূর গান উঠিয়া গিয়াছে। আমার নিজের কথা বলিতেছি না, কিন্তু আমি জানি, অনেকে সঙ্গীত-শ্রবণ-পিপাসায় গণিকার গৃহে যাতায়াত করিতে করিতে নিজেদের সর্ব্বনাশ করে। আমার পক্ষেও যে ঐ দিনকার ঘটনা কত দূর বিষময় হইয়াছিল সেই কথা এখন বলিব। সুনীলার গান শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম, তন্ময় হইয়া শুনিতেছিলাম, আমি চিরদিনই সঙ্গীত-প্রিয়; তাহার মধুর টপ্পার "ছোটী ছোটী মুর কিয়াঁ" যেন ঘরের চারিধারে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। আবার, তাহার সুস্বরের বিরামে তাহার তান-লয়-সমন্বিত মঞ্জীর মুখর নৃত্য বাদ্যের স্বরের সহিত নিপুণভাবে মিশিয়া, ভাব ব্যঞ্জনার সহযোগে যেন চতুর্দ্দিকে মত্ততা ছড়াইয়া দিতেছিল। আমি যখন ঐ মত্ততার মাঝে নিজেকে ডুবাইয়া

দিবার করিতেছিলাম, ঠিক সেই য় আমার এক পুরাতন মদ্য-সহচর আসিয়া বলিল,—"কি হে, গানে যে ডুবে থাক দেখ্‌ছি, আরে এ সব কি শাদা চ'খে ভাল লাগে, এস একটু প্রাণটায় রং ধরিয়ে নাও; তবে তো বাইজীর কদর বুঝ্‌বে।" গান যতই ভাল লাগুক এ আহ্বান অবহেলা করিতে পারিলাম না; যে মদ্যপান করে, সে এমন সময়ে কি মদ প্রত্যাখ্যান করিতে পারে? সে সুখে মদ খায়, দুঃখে শোকে মদ খায়, একটা অছিলা পাইলেই মদ খাওয়ার বাড়াবাড়ি করে। আমিও তাহাই করিলাম, মদ্যপান করিলাম। মদ্যপানের আয়োজন হইয়াছিল একটা স্বতন্ত্র ঘরে—আয়োজন অপর্য্যাপ্ত; বোতল বোতল দামী "পাণীয়ম্", টেবিলের উপর সাজান, শুভ্র কাঁচের গ্ল্যাস, রাশীকৃত সোডা ওয়াটারের বোতল, সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ সুস্বাদু খাদ্য, সোজা কথায় "মদের চাট" টেবিলের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। সুরাদেবী যেন আমার মত ভক্তবৃন্দকে সাদরে আহ্বান করিয়া নরকে যাইবার দ্রবময়ী বীথি দেখাইয়া দিতেছে। কাজেই দেবীর সম্বর্দ্ধনা করিতে হইল। এক পাত্র টানিয়া মনে করিলাম যে, আমোদ করিবার উপযোগিতা লাভ করিলাম বটে, এতক্ষণ নিরামিষ আমোদ চলিতেছিল, এইবার প্রাণে যথার্থ আনন্দ আসিল। মদ্যপান করিয়া আবার আসরে গিয়া বসিলাম; ভাল করিয়া গান শুনিব বলিয়া। সুনীলা তখন থিয়েটারের গান ধরিয়াছিল—বাবুদের ফরমাস থিয়েটারের গান, না হয় বাঙ্গালা গান, তাহা না হইলে তাঁহাদের ভাল লাগে না। সে গাহিতেছিল

দে সাকীদে ভর পিয়ালা পিলাও

দারুচিন।

সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র পদ বিক্ষেপে তাহার নৃত্যও চলিতেছিল। "পাদন্যাসো লয়মুপগত স্তন্ময়ত্বং রসেষু।"

তাইতো, এতক্ষণ যেন আমাদের অর্দ্ধেকটাই নষ্ট হইতেছিল। ঐ একটু খানি লাল জল—তাহার কত গুণ; যেন চক্ষের উপর হইতে পরদা সরিয়া গেল; আমি দেখিলাম সুনীলা তো কেবল সুগায়িকা, সুনর্ত্তকী নয়, সে যে সুন্দরী। প্রতি পদ বিক্ষেপে তাহার

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।

কি অপূর্ব্ব রূপ ইহার, মুখে কি সুন্দর সুষমা, নয়নে কি বঙ্কিম তীব্র কটাক্ষ, কুসুম পেলব ভুজদ্বয়ের কি সুঠাম গঠন, যেন প্রতি হস্ত বিক্ষেপে, প্রতি পদ সঞ্চালনে নূতন নূতন মোহের সৃষ্টি করিতেছে। নৃত্যের বিরামে—

বামং সন্ধি স্তিমিত বলয়ং ন্যস্য হস্তং নিতম্বে,
কৃত্বা শ্যামা বিটপ সদৃশং স্রস্ত মুক্তং দ্বিতীয়ম্।
পাদাঙ্গুষ্ঠালুলিত কুসুমে কুট্টিমে পাতিতাক্ষং
নৃত্যা দাস্যাঃ স্থিতমতিতরাং কাণ্ড মৃজ্বায় তার্দ্ধম্॥

ইহার সকল অবস্থাতেই যেন নূতন শোভা। ইহার হাব ভাব সুন্দর, কথা মধুর, অতি সুন্দর এই সুনীলা। পূর্ব্বে তো এতটা লক্ষ্য করি নাই, এখন কারণ-বারি প্রসাদাৎ দেবেন্দ্র যেমন হীরার রূপ আবিষ্কার করিয়াছিল, আমিও তাহাই করিলাম। আগে কেবল নর্ত্তকী দেখিতেছিলাম, এখন সুন্দরী দেখিলাম; আগে গান শুনিতেছিলাম, এখন গায়িকাকে লক্ষ্য করিলাম। বলিহারি বোতল-বাহিণীকে! তরল আনন্দ ঘনীভূত হইতে লাগিল, আবার মদ খাইলাম।

এবার আমার সুপ্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তি গুলা জাগিয়া উঠিল। প্রাণের ভিতরে লালসা-বহ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। নিপুণ শিল্পীর

শিল্পকলা ভুলিয়া তাহার দেহের প্রতি সমস্ত মনটা গিয়া পড়িল ; সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন একত্র হইয়া আমার চক্ষের ভিতর আশ্রয় লইল। নেশার ঝোঁকে দেখিলাম, যেন জগতের সকল সুষমার সমাবেশে এই নারীর কমনীয় দেহ কান্তি গঠিত হইয়াছে—সমস্ত জগৎ একদিকে, আর এই সুনীলা এক দিকে। উহার রূপের অনলে পতঙ্গবৎ আত্মসমর্পণ—ইহাই বুঝি পুরুষার্থ। জীবন-মধ্যাহ্ন অপগত হইয়া জীবন-সন্ধ্যার মুখে আসিয়া পড়িয়াছি, তথাপি এ যৌবন-জল-তরঙ্গ বন্যার মত হৃদয়ের সর্ব্বাংশ সম্পূর্ণ ভাবে প্লাবিত করিয়া দিল কেমন করিয়া? কে বলিয়া দিবে কেন? অন্তরের মধ্যস্থল হইতে নিরাশ প্রতিধ্বনি উঠিতেছে—অদৃষ্ট নিয়তি। তাহা না হইলে সাপটাকে মারিলাম না কেন? আজ সময় পাইয়া ঐ দুধ কলা দিয়া পোষা সাপ আমাকে মর্ম্মান্তিক দংশন করিল! বহুদিন ধরিয়া যে মিত-পায়িত্ব সঞ্চয় করিতেছিলাম, একদিনে, এক নিঃশ্বাসে আমার সেই তাসের ঘর ধরাশায়ী হইল। আমার আর ভাল হওয়া হইল না। কি করিয়া প্রবৃত্তি দমন করি? রূপসী সুনীলা যে তখনও গায়িতেছে :—

পায় নিয়া মেরি বাজেরে পিয় ঝনক ঝনক
পিয় ঝন নন নন নন।

তুঁহু বোলাওয়ে কৈসে না আওয়ে
শাম ননদ মেরা বৈরণ রে।
বৈরণ ননদিয়া জাগে রে॥

ঠমকে ঠমকে যেন আমার প্রাণের উপর পদবিক্ষেপ করিয়া সে অপরূপ ভঙ্গিতে ঐ যে সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মত হেলিতে দুলিতে আমারই দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। ক্যাবাৎ মেরি প্যারী

ক্যাবাৎ—আরও মদ, আরও মদ, দে সাকী দে ভর পিয়ালা পিলাও দারুফিন্। লাল জল, লাল আলো, লাল মুখ, বিশ্ব সংসার আজ্ লাল হইয়া গিয়াছে। প্রাণের আকাঙ্ক্ষা যে আর চাপিয়া রাখা যায় না, উৎকট আনন্দে মন পাগল হইয়া উঠিল, মনে হইতে লাগিল তাহাকে ডাকিয়া বলি—

কবরী ভয়ে চামরী গিরি কন্দরে, মুখ ভরে চাঁদ আকাশে
হরিণী নয়ন ভয়ে স্বর ভয়ে কোকিল,
গতি ভয়ে গজ বনবাসে।
সুন্দরি! কাহে তু না মোহে সম্ভাষি যাসি
তুয় ভয়ে ইহ সব দূর পলাওয়ল
তুঁহু পুন কাহে ডরাসি।

"সুন্দরি! আর গাহিও না, আর তোমার কোমল চরণে ব্যথা দিয়া নাচিও না, তুমি পরিশ্রান্ত. পদ্মপত্র নাই, এস এই তালবৃন্তের সমীর তুলিয়া তোমার ক্লান্ত অঙ্গ বিশ্রান্ত করি, দাও সুন্দরীকে Icecream দাও, প্রাণ শীতল হউক, সুবাসিত তাম্বুল দাও, রাঙ্গা অধর আরও উজ্জ্বল হউক, ফুলের অঙ্গে ফুল চাপাও, সুগন্ধ গোলাপ জলে অঙ্গ সুবাসিত কর। আর দাও সর্ব্ব শান্তিনাশিনী সুরা।"

"Let us have wine, woman, mirth and laughter
Sermon and soda water the day after".

এই তো সুখ, এই তো আনন্দ, এই তো উল্লাস। আত্মসংবরণ ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া পড়িতেছিল, মনে হইতেছিল আনন্দে চীৎকার করিয়া গান করি, অথবা সুনীলার নাচের সঙ্গে পদ মিশাইয়া নৃত্য

করি। মাতালের আনন্দ! আমার মত মাতাল কবি সেই মজ্‌লিসে আর কেহ ছিল কিনা জানি না, তবে আমারই মত নিছক মাতাল আরও অনেকে ছিল, আমারই মত ইন্দ্রিয়-লোলুপ মাতাল আরও অনেকে ছিল; আমি যতটুকু আত্মসংবরণ করিতে পারিতেছিলাম, ইহারা তাহাও পারিতেছিল না; ইহাদের আদরের অত্যাচারে গায়িকা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। আমি ততক্ষণ কেবল মদ খাইতেছিলাম। ইন্দ্রিয়ের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্যই ক্রমাগত মদ খাইতেছিলাম। মনে আছে যে, গীত ও নৃত্যের পরিবর্ত্তে একটা হৈ চৈ হইতে লাগিল; তার পর কি হইল তাহা আর আমার মনে নাই। শুনিয়াছি যে আমিও ঐ বীভৎস কাণ্ডের মধ্যে ছিলাম, ও কেলেঙ্কারি করিয়াছিলাম।

প্রভাতে যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখনও নেশা একেবারে কাটে নাই, তবে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছি। বাগানের তখন ভাঙ্গা হাট, আমার মত দুই এক জন মাতাল যাহারা তখনও পড়িয়া ঘুমাইতেছিল, তাহারা আর কয়েকজন ভৃত্য ভিন্ন আর কেহই ছিল না। ভৃত্যেরা পূর্ব্বদিনের আনীত তৈজস পত্রাদি গুছাইতেছে, আসবাব আদি সাজাইয়া রাখিতেছে এবং কতক চালান করিতেছে। বাসনার বিষে মন তখনও ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে—সে হুরি কোথায় যে আমাকে পাগল করিয়াছিল? মদমত্ত মাতঙ্গের মত মনটা তখনও উধাও হইয়া তাহারই সন্ধানে ফিরিতেছিল; বন্ধনহীন হইয়া ছুটিয়া চলিতেছিল। পল্লীগ্রামের পথে বৈষ্ণবগণ ভৈরোঁ রাগে প্রভাতী গাহিয়া গৃহস্থদের জাগাইতেছিল। "ভোর ভয়ো পক্ষীগণ বোলে, উঠত নন্দ লালা জী!" করতাল সহযোগে কাণে বড় মিষ্ট লাগিতেছিল, কিন্তু মনে লাগিতেছিল না। গঙ্গার দিক্ হইতে প্রভাত সমীরণ পাখীর গান বহন করি

বুকের উপর দিয়া তর্ তর্ করিয়া বহিয়া যাইতেছিল, শরীর কতক শীতল হইতেছিল, কিন্তু তাহাও যেন মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেছিল না—যেন সেই সমীরণের সহিত আকুল ক্রন্দন ভাসিয়া আসিতেছিল,—

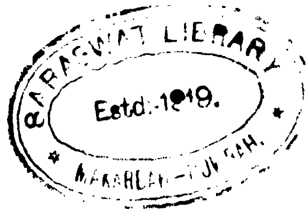
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধু মাঝে তরঙ্গের দল
শস্য শীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল ;
তব স্তনহার হ'তে নভস্তলে খসে পড়ে তারা
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা
নাচে রক্তধারা ॥

আমার ক্ষুব্ধ বিধ্বস্ত হৃদয়ের মাঝে রক্তধারার চঞ্চল নৃত্য আজিও যেন অবিশ্রামে চলিয়াছে ; জগতের কিছুই ভাল লাগিতেছে না। প্রাতঃকালে উঠিয়া আবার একটু মদ্য পান করিলাম—"খোঁয়ারি ভাঙ্গিবার" জন্য। শরীর কতক ধাতুস্থ হইল, বাড়ী ফিরিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া দিনের বেলা কোনও রকমে কাটাইলাম। তাহার পর কি করিয়াছিলাম; তাহা আমি নিজের কথায় বলিব না, নীরস হইবে। মাতালের কথায় কি রস থাকে? কি উপায়ে এই বিষম নেশার ঘোর কাটিয়াছিল, তাই তাহারই কথায় বলি যে আমার নেশা কাটাইয়াছিল। সে বিবরণ আমি রাখিয়া দিয়াছি ; আমার মৃত্যুর পর যদি কেহ এই বিবরণী প্রকাশ করিতে চাহেন, তাহা হইলে ঐ পত্র এইখানে যোগ করিয়া দিলে আমার পাপ জীবনের কাহিনী সম্পূর্ণ হইবে।

সে যাত্রা নেশার ঘোর কাটিয়াছিল বটে, কিন্তু আমি আর উঠিতে

পারিলাম না; ছিন্নমস্তার মত আমার প্রবৃত্তি নিজের মাথা কাটিয়া নিজের রক্ত পান করিল, সে পিপাসা আর ইহজন্মে মিটিল না। সেই রাত্রেই বহুদূর হইতে কালের ভেরী আমাকে আহ্বান করিল, আজ্ তাই আমি ব্যাধ-ধ্বনিত বংশী শুনিয়া মৃগের ন্যায় কালের কোলে আসিয়া পড়িয়াছি।



সুনীলার পত্র।

"মহাশয় আপনি ভদ্রলোক, আপনাকে দু একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। কিছু মনে করিবেন না, আপনি ভদ্রসন্তান. শুনিয়াছি আপনি ব্রাহ্মণ, আমি সামান্য পতিতা নারী, আমি আপনাকে কোনও কথা জোর করিয়া বলিবার যোগ্যা নই, সে দাবীও রাখি না, তবু যে দু একটা বলিতেছি তাহা নিজের স্বার্থের জন্যই বলিতে হইতেছে, ইহা মনে রাখিয়া আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। আমরা স্বার্থপর জাতি, স্বার্থ ভিন্ন কোনও কথা বলি না, কোনও কাজ করি না; এইটুকু মনে রাখিবেন, আমি আপনাকে উপদেশ দিবার ধৃষ্টতা রাখি না।

"যে দিন—বাবুর বাগানে আমি গীত নৃত্যের জন্য আহূত হই, সেই দিন রাত্রি হইতেই দেখিতেছি আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছুক। তাহার পরদিন হইতে আপনি প্রত্যহই আমার কুটীরে আসিতেছেন, আমার গীত শ্রবণ করিয়া আমাকে শুধু প্রশংসা করিয়াছেন তাহা নহে, যথেষ্ট অর্থও দিয়াছেন, আমি তাহা লইতে দ্বিধা বোধ করি নাই, অথচ আপনার চক্ষে মুখে যে লালসা স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়াছি তাহা পূরণ করি নাই; তাহাতে আপনি যে কয়েকদিন মর্ম্মাহত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন তাহাও লক্ষ্য করিয়াছি। আপনি আমার ভবনে বসিয়া আমোদ করিয়াছেন, মদ খাইয়াছেন, আমাকেও আমোদ দিয়াছেন, তাহাতে আমি বাধা দিই নাই, কিন্তু স্পষ্টতঃ যাহার জন্য আপনি আমার কাছে আসিতেন তাহাতেই বাধা দিয়া আপনাকে

কষ্ট দিয়াছি। কেন? আপনি যদি মনে করিয়া থাকেন যে ধর্ম্ম ভাবিয়া তাহা করিয়াছি তাহা নহে। আপনারা ভাবেন যে আমরা যে পথে দাঁড়াইয়াছি, তাহাতে আমাদের দেহ যে অর্থ-লভ্য, অর্থ স্বরূপ মূল্য দিলেই উহা ক্রয় করা যায়। সেই আশাতেই আপনি অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হন নাই। আমাদের সাধারণতঃ যেরূপ ব্যবসায়, তাহাতে অমনটা মনে করায় আপনার বিশেষ কোনও ভুল হয় নাই; তবে যে আমি আপনার আশা পূর্ণ করিলাম না, তাহার কারণ জানিবার জন্য আপনার ঔৎসুক্য হওয়া স্বাভাবিক ভাবিয়াই এই পত্র আপনার হস্তে আজ্ দিতেছি, পাঠ করিয়া বাধিত করিবেন। আপনি আমার জীবনকাহিনী জানিতে চাহিয়াছিলেন, এ পত্রে কতক তাহার আভাষও দিলাম। আপনার কামনা পূর্ণ না করিয়া আপনার ভাল করিয়াছি কি অপকার করিয়াছি তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না, তবে এটুকু নিশ্চয় জানিবেন যে, আমরা অনেক পুরুষকেই তো দেখি, এ জীবনে এই বয়সেই অনেক সুখলুব্ধ মানুষ দেখিয়াছি, তাহাদের মনের ভাব বুঝিবার শক্তিও কতক কতক হইয়াছে, তাহা বলিলে বোধ হয় বৃথা গর্ব্ব করা হইবে না। আমি একটা কথা কেমন বুঝিয়াছি তাহাই আপনাকে জানাইব, কিছু মনে করিবেন না। আপনি মনে করিতেছেন যে বুঝি যথার্থই আমাকে ভাল বাসিয়াছেন, আমাকে না পাইলে আপনার সুখ থাকিবে না, জীবন অশান্তিপূর্ণ হইবে। কিন্তু আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, যে ওটা আপনার ভুল, আপনি এখন লালসায় আত্মহারা হইয়াছেন, ভালবাসায় নয়। আপনি চাহেন আমার দেহটা—আপনি কি জানেন না যে বেশ্যার প্রাণ নাই—প্রাণ থাকিলে তাহাদের চলে না। জানিয়া শুনিয়াও আপনি আমার কাছে কোন্ আশাতে আসিতেছেন? ঐ ইন্দ্রিয়-লালসা তৃপ্ত হয় নাই বলিয়াই

আপনি ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন ; আমার কাছে ভালবাসা পান নাই বলিয়া নহে। ভালবাসা পাইবার জন্য কি কেহ মদ খাইতে থাকে—না মাতাল হইয়া ভালবাসার দাবী করিতে পারে ? আমরা দেহ-বিক্রেত্রী আমাদের অত ভাবিবার প্রয়োজন হয় না, ভাবিবার বোধ হয় অধিকারও নাই, বলুন দেখি, এই কথা আপনার মনে হয় কিনা ? আমি যে বলিয়াছি যে বেশ্যার প্রাণ নাই—বলুন দেখি পুরুষে সেই কথাই ভাবে কিনা ? প্রাণ আছে কি না আছে তাহা কি কেহ কখনও যাচিয়া দেখিয়াছে ? সকলেই ভাবে আমরা প্রাণ-হীনা, আমরা কেবল পৃথিবীর বুকে পাপের ভরা চাপাইয়া রাখিতেই জন্মিয়াছি। কথাটা অনেক পরিমাণে সত্য, তবে সম্পূর্ণ সত্য নয়, এটা নিশ্চয় জানিবেন। তবে এ কথাও সত্য যে, আমরা যদি প্রাণের খেলা খেলিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের অবস্থা যে খুব ভাল দাঁড়ায় তাহা নহে ; আমি বলিতেছি সাংসারিক অবস্থার কথা। যাহারা আমাদের কাছে আসে তাহারা আমাদের প্রাণ খোঁজে না, যদি বা কেহ খোঁজে সে উহা লইয়াই তো সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, কারণ আমরা যে সমাজের বাহিরে, সমাজ ত্যাগ করিয়া আমাদের লইয়া প্রেমের খেলা কে খেলিতে চায় ? আমরা যে পথে চলি তাহাতে আমাদের অধিকাংশই অর্থ-পিশাচী হইয়া দাঁড়ায় ; আবার যে নির্বোধেরা আমাদের কাছে আসে, তাহাদের আমরা নিঃস্ব করিয়া ছাড়িয়া দিই, লোকে তো ইহাই দেখে, ইহাই জানে। তবে কি আপনি আমার কাছে সত্যই ভালবাসার প্রত্যাশায় আসিয়াছিলেন—আপনার অগাধ ভালবাসা দিবার জন্য আসিয়াছিলেন ? এখন যাহাই মনে করুন, তাহা কিন্তু নয় জানিবেন—দুদিনেই এ ভুল আপনার ভাঙ্গিবে, তখন বুঝিবেন আপনি কোন্ সুখের অনুসন্ধানে এখানে আসিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক, আমি তো গণিকা মাত্র, তবে আপনার বাসনা পূর্ণ

করিতেই বা আমার কি বাধা ছিল? বেশ বুঝিতেছি যে, আপনি টাকা দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, তবে আমি আপনাকে প্রত্যাখ্যান করিলাম কেন? কেন শুনিবেন?

আপনার মুখেই আপনার সকল পরিচয় ব্যক্ত হইয়াছে। আপনি ভদ্রসন্তান ব্রাহ্মণ; যে ব্রাহ্মণ আমাদের দেশে একদিন কতই না পূজা পাইতেন। আপনি গৃহস্থ, স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া আপনার ঘরবাঁধা। আপনি উপার্জ্জন করিয়া সংসার প্রতিপালন করেন, পৈত্রিক অর্থের বলে বাবুয়ানি করিতেছেন না, এ সকল বিবরণ আপনারই মুখ হইতে বাহির করিয়া লইয়াছি। তা এ হ'লেই বা আমার কি? আমি আপনার লালসার বহ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়া আপনার অর্থ শোষণ করিলাম না কেন? একবার ভাবিয়াছিলাম যে, সে কাজ আপনাকে বলিয়াই বা কি ফল? আমার যাহা ইচ্ছা হইয়াছে তাহাই করিয়াছি, আমার কার্য্যের জন্য আমি কাহারও নিকট কৈফিয়ৎ দিতে অবশ্যই বাধ্য নহি। কিন্তু পরে ঠিক করিলাম যে, আপনার কৌতুহল চরিতার্থ করা আমার কর্ত্তব্য। কেননা, আমি আপনার টাকা খাইয়াছি অথচ আপনার মনের ইচ্ছা পূরণ করি নাই। সামান্য বেশ্যার মুখে এই সব কথা শুনিয়া হাসিবেন না; কারণ আমি চিরদিন বেশ্যা ছিলাম না, আমিও আপনারই মত ভদ্রলোক ছিলাম। তবে যে আজ্ এই কুৎসিত ব্যবসায় গ্রহণ করিয়াছি সেটা আমার অদৃষ্ট! তাই বা বলি কেন? সেটা আমার নিজের কর্ম্মেরই দোষে।

আমি বড় মানুষের মেয়ে হইয়া ভদ্রঘরেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি আমার পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান—বড় আদরের মেয়ে।. বাল্য-কালে পিতামাতা যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাতে লোকতঃ যাহাকে লেখা পড়া শেখা বলে তাহা যে না শিখিয়াছিলাম তাহা নহে; তবে সে শিক্ষায় আমার কোনও ফল হয় নাই। সৎশিক্ষা কোনও দিন পাই নাই।

যাহাতে চরিত্র গঠিত হয় তেমন শিক্ষা কেহ আমাকে দেয় নাই, কেবল কতকগুলা বই পড়িলেই যে শিক্ষা হয় না, তাহা আমার বাপ মা উভয়ের কেহই বুঝিলেন না। আমি যখন যাহা ধরিতাম তাহা করিতাম ; কেহ কখনও নিষেধ করিত না ; এইরূপে আমার চরিত্রে যথেচ্ছাচারিতাটা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহার উপর আমার বিলাসিতার পরিপোষক সকল আয়োজন সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত, ইহার এতটুকু ত্রুটি হইলে শুধু যে আমি ক্রোধে জ্ঞানহারা হইতাম তাহা নহে, আমার পিতা মাতাও সেই সময় আমাকে শাসন না করিয়া আমার খেয়ালের সমর্থন করিতেন। এইভাবে বিলাসিতায়, ও একগুঁয়েমিতে আমি পরিপক্ব হইতে লাগিলাম। কেহ কখনও আমাকে শেখায় নাই যে, এইভাবে বোধহয় চিরদিন চলিবেনা—বাঙ্গালী হিন্দুর কন্যা আমি, আমার জীবন অন্যভাবে গঠিত হওয়া উচিত। কাহারও অধীন হইয়া থাকা আমার কখনও অভ্যাস হয় নাই, উচ্ছৃঙ্খলতা জীবনের মূলমন্ত্র হইয়া ছিল দৃষ্টান্ত দ্বারাও আমি কখনও সংযম শিখি নাই। আমার পিতা কলিকাতার বাবু ছিলেন তিনি বিলাসিতায় দিন কাটাইতেন, একটু আধটু নেশাও করিতেন, এবং আরও উপসর্গও ছিল। আমার জননী যিনি, তিনিও বিলাসিতারই পক্ষপাতিনী ছিলেন, আমার পিতার কাছে তিনিও কখনও সংযমের শিক্ষা পান নাই, অনেকটা তদ্বিপরীত শিক্ষাতেই পরিপুষ্ট হইয়াছিলেন। এইরূপে গৃহস্থ কন্যার জীবনের পরিবর্ত্তে রঙ্গিনী বিলাসিনীর জীবন লাভ করিতে লাগিলাম। সঙ্গে সঙ্গে নাটক নভেল কবিতা চর্চ্চা চলিতে লাগিল। ধর্ম্ম বলিয়া কোনও বস্তু আছে এটা আর আমার অদৃষ্টে শেখা হইল না, চরিত্র বলিয়া কোনও বস্তুর আদর করিতে শিখিলাম না। স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করিবার প্রলোভনই আমার মনে দৃঢ় হইতে লাগিল, সে কথা আমার বাবা মা ভাবিয়াও দেখিলেন না।

তাঁহারা যে সমাজের লোক, সে সমাজে যে কন্যা চিরদিন তাঁহাদেরই আদরিণী হইয়া থাকিবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না! সে কথা তাঁহারা একেবারে ভুলিয়া গিয়া আদর দিয়া আমার মাথা খারাপ করিয়া দিলেন। অথচ একদিন তাঁহাদের আমাকে পরহস্তে দিতে হইল। যতদিন সম্ভব তাঁহারা আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আর তো রাখিতে পারিলেন না, আমার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহোৎসবের কথা আর বলিয়া কি হইবে? সেই বিবাহই আমার কাল হইল। আমাকে শ্বশুরালয় "ঘর" করিতে যাইতে হইল।

যিনি আমার স্বামী হইলেন তিনি আমাদের মত বড় মানুষ নন। তিনি শিক্ষিত ভদ্রলোক; উপার্জ্জনও করেন মন্দ নয়, কিন্তু তিনি হিন্দু গৃহস্থ, কাজেই তিনি আরও পাঁচজনের সঙ্গে একত্র বাস করেন, পাঁচজনকে প্রতিপালন করেন, শুধু বধূ লইয়াই সংসার পাতেন নাই তিনি আমাকে আদর যত্ন করিতেন, কিন্তু আমার বিলাসিতার বা আমার উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির পোষকতা করিবার মত তাঁহার অর্থ সচ্ছলতাও ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। আর ছিলনা তাঁহার নভেলিয়ানা ঢং, নভেলি ছাঁদে ভালবাসা দেখান। এই সব মহদ্দোষে আমি তাঁহাকে সুচক্ষে দেখিতে পারিলাম না। তাহার উপর আমি কোথায় ছবিটীর মতন সাজিয়া গুজিয়া বসিয়া থাকিব; আমার স্বামী আসিয়া ফুলের মালা— আমার কোমল কণ্ঠে দুলাইয়া সারাদিন সোহাগ করিবেন, শত নূতন প্রণয়ের সম্বোধনে তৃপ্ত করিবেন, আমার নবমুকুলিত বাসনা-রাশির চরিতার্থতা বিধানের জন্য সদা যত্নশীল থাকিবেন, আমিও আমার বাছা বাছা নভেলি বোল ছাড়িয়া তাঁহাকে আমার হৃদয়ের দ্বারে টোকা মারিবার অধিকার দিয়া মনে ভাবিব যে অনেক দিয়াছি, তাহা—না হইয়া—আমার শাশুড়ী কিনা বলে গৃহকর্ম্ম করিতে, আমার স্বামী কিনা বলেন তাঁহার

সব কুপোষ্যদের আদর যত্ন করিতে! দু দিনেই আমার পিত্ত চটিয়া গেল। আমি কি এই জন্য সংসারে আসিয়াছি—আমি আতর মাখিব, আলতা পরিব, সাবান দিয়া গা পরিস্কার করিব, নভেল পড়িব, হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান করিব; সকলে আমার এই সব কাজে সহায়তা করিবে এবং আমাকে ফুলের মত সজ্জিত ভূষিত করিয়া আমার রূপের উজ্জ্বলতা বাড়াইবে। সেই আমি কিনা আগুণে ফুঁ দিয়া আমার নবনীত-কোমল পদ্মমুখখানি মলিন করিয়া ফেলিব, হাতা বেড়ি ধরিয়া আমার মৃণাল-ভুজকে ব্যথিত করিব; ছি! ছি! এই কি আমার স্বামী, আমার প্রণয়াধীন স্বামী! এ বাপু আমার পোষাইবে না—এখানে থাকা আমার হইতেই পারে না। স্বামী আমার শিখাইতে আসেন, ধর্ম্মের বক্তৃতা দেন; শাশুড়ী গৃহস্থ বধূর কর্ত্তব্য শিখাইতে চাহেন; অন্যান্য সকলেই আমাকে তাহাদের সুখের উপায় স্বরূপ ভাবে; এ কি আমি সহ্য করিতে পারি? আমি নিজের মতে চলিব, কাহারও কথা মত চলিতে পারিব না। বেশী কথায় কাজ নাই, আমি মাকে পত্র লিখিয়া কোনও উপায়ে পিত্রালয়ে ফিরিয়া গেলাম॥

কেহ কি শুনিয়াছেন যে, মা মায়ের শত্রু হয়—মা মেয়েকে বিপথে লইয়া যায়? আমার মা কিন্তু ঠিক ঐ কার্য্যটাই করিলেন। আমার মুখে অতিরঞ্জিত ভাষায় আমার স্বামি-গৃহবাসের কষ্টের কথা শুনিয়া তিনি বিষম রাগ করিলেন; যদি আমাকে লইয়া স্বামী পৃথক্ না হন, তাহা হইলে কুরুক্ষেত্র করিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন। পিতা আমার নিজের বদ্‌খেয়ালি লইয়াই থাকেন, সংসারের খোঁজ খবর লইবার বড় একটা অবকাশ তাঁহার থাকে না, তিনিও এ কথা শুনিয়া আমার স্বামীর উপর চটিয়া গেলে। আমি আমার চিরাভ্যস্ত উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে বাড়িতে লাগিলাম। ইহার কিছু দিন পরেই বাবা মারা গেলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর দেখা গেল তিনি বিষয়াদি সব নষ্ট করিয়া গিয়াছেন, যাহা বাকি আছে তাহাতে কষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারে। মার ও আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল; কি করিয়া আমাদের বাবুয়ানা চলিবে এই ভাবনাই হইল আমাদের প্রধান। পিতার শ্রাদ্ধের সময় স্বামী আসিয়া লইয়া যাইতে চাহিলেন; কিন্তু মার সেই ধনুর্ভঙ্গ পণ—আমাকে লইয়া যদি স্বামী পৃথক হ'ন; যদি তাঁহার সমস্ত উপার্জ্জন ভাই ভগ্নীদের সেবায় না লাগাইয়া আমার পরিতোষার্থ নিয়োজিত করেন, তবেই তিনি আমায় পাঠাইবেন, নচেৎ নয়। কিন্তু আমার স্বামী মানুষ; পশু জীবন যাপন করিতে তিনি নারাজ; কাজেই আমার আর সে যাত্রা শ্বশুর বাড়ী যাওয়া হইল না। ক্রমশঃ আমাদের অবস্থা যখন জানিতে পারিলেন, তখন আর একবার স্বামী চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তখনও মা আমাকে পাঠাইলেন না; আমিও যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলাম না; কিছুতেই আমি সে সব বিলাসবাসনার হাত এড়াইতে পারিলাম না। যেন তেন প্রকারেণ বিলাসিতা আমার চাইই। স্বামীকে নিরাশ করিয়া বিদায় দিতে একটু যে মনে কষ্ট না হইয়াছিল তাহা নয়; কিন্তু সেখানে গেলেই যে খাটিতে হইবে, বিলাসহীন হইতে হইবে, এই ভাবনাই আমার বেশী হইল। আমার মনে ঘুণ ধরিয়াছিল, তাই অমন স্বামীকেও অনায়াসে পরিত্যাগ করিলাম। আমি স্বামীর সহচরী বিলাস-সঙ্গিনী হইতে পারি, কিন্তু তাঁহার সংসারের বাঁদী হইতে পারি না ইহাই আমার শিক্ষা। কি করিব? তাঁহার অগাধ ভালবাসার মর্ম্ম আমি পাপীয়সী বুঝিতে পারিলাম না, আমার মাও আমায় তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন না; তিনিও যে আমারই মত বিলাস-পঙ্কে নিমগ্না! আমি থাকিতে চাই স্বাধীন ভাবে, কাহারও আজ্ঞাধীন হইয়া নয়। যাক্, এই রকম করিয়াই আমার বিবাহিত জীবনের শেষ হইল। এক একবার প্রাণটা যে আকুল

না হইত তাহা নয়, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা সাম্‌লাইয়া লইতাম—বিলাস চেষ্টায় মগ্ন হইতাম।

ক্রমে মা দেখিলেন যে যাহা আছে তাহা দ্বারা তাঁহার ও আমার বিলাস-বাসনা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। আশ্চর্য্য! তিনি হিন্দু বিধবা, অথচ তাঁহার হাড়ে হাড়ে ঐ বিলাসিতা বিঁধিয়াছিল; তিনি বাবুয়ানি ভিন্ন থাকিতে পারেন না। ঐ শিক্ষাতেই যে তিনি আর আমি পরিপুষ্ট হইয়াছি, উহাই যে হইয়াছিল, আমাদের জীবনের আদর্শ। তেমন মন ও তেমন শিক্ষা থাকিলে আমি পতিগৃহের দারিদ্র্যের মধ্যেও রাজরাণী হইয়া থাকিতে পারিতাম, আমার এই ভরা যৌবন, এই অতুল রূপ রাশি ব্যর্থ হইত না; কিন্তু মা আমার বুঝিলেন অন্য রূপ, আর আমিও বুঝিলাম রূপ। মায়ের প্ররোচনায়—উঃ এ কথা ভাবিলেও এখন সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠে—পাপ-পথে পা বাড়াইলাম। মেয়ের দ্বারা তিনি নিজের বিলাস-বাসনা পরিতৃপ্ত করিতে কৃতসংকল্প হইয়া আমাকে কত কি বুঝাইলেন। আমার এই রূপ এই যৌবন যদি ভোগেই না লাগাইলাম তাহা হইলে এ রূপ এ যৌবন লইয়া লাভ হইল কি? জগতে ভোগই সর্ব্বস্ব ইহকাল পরকাল সে সব মিথ্যা কল্পনা; যেমন করিয়া পারা যায় জগতে সুখ পাওয়া চাই ইত্যাদি নানা প্রলোভন দেখাইয়া আমাকে তিনি বিপথ গামিনী করিলেন। মা আমাকে একজন চরিত্রহীন ধনমদোন্মত্ত মাতালের হাতে তুলিয়া দিলেন। এই সূত্রে তাঁহার বিলাসিতা চলিতে পারে এই জন্য অনেক অর্থ হস্তগত করিলেন। আপনি হয় তো এ কথা বিশ্বাস করিবেন না, কিন্তু এ সত্য কথা, সৎশিক্ষার অভাবে জগতে এমন হইয়া থাকে। কখনও ভাবিবেন না যে, আমার নিজের দোষ ঢাকিবার জন্য আমি একথা বলিতেছি। আমার নিজের মনে যদি বিলাস-বাসনা প্রবল না হইত, তাহা হইলে কি আমি মার কথা শুনিয়াই এ পথে আসিতাম? দোষ

আমার নিজের ; আমায় স্বামী তখনও অন্য বিবাহ করেন নাই ; বলিয়া পাঠাইলেই তিনি আমাকে যত্ন করিয়া লইয়া যাইতেন ও মাথায় করিয়া রাখিতেন ইহা জানিয়া শুনিয়াও আমি নিজের পঙ্কিল বাসনারই বশবর্ত্তী হইয়া পাপ পথের পথিক হইলাম। তখন বুঝিতে পারি নাই এ পথে কত সুখ!

যে আমাকে টাকা দিয়া কিনিল, সে দিন কতক আমাকে বড়ই আদরে রাখিল, সে কথা অস্বীকার করিব না, তাহারই যত্নে ও অর্থে আমি ওস্তাদের কাছে রীতিমত গান শিখিলাম, ভাল নর্ত্তকী রাখিয়া সে আমাকে নাচ শিখাইল ; তার পর আরও কত কি শিখাইল, তাহা আর নাই বা বলিলাম। ভদ্রকন্যা আমি, বার-বণিতায় হাব ভাব কায়দা কানুন সব শিখিতে লাগিলাম। এই খানে বলিয়া রাখি যে, অনেকের বিশ্বাস—কেবল কামের বা প্রণয়ের বেগেই স্ত্রীলোকে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে। কিন্তু সেটা অনেক ক্ষেত্রে সত্য হইলেও সবক্ষেত্রে নয়। আমি কেবল বিলাসিতার খাতিরেই কুলের বাহির হইয়াছিলাম, এবং আমার মত অনেক এমন হয়। তাই কত দিন আমার বাবুটী আমার বশবর্ত্তী হইয়া আমার বাবুয়ানি সাজ সজ্জায় ও অন্য প্রকার নানাবিধ বিলাসিতার যোগান দিয়া যাইতেছিল, ততদিন এক রকম কাটিয়া ছিল মন্দ নয়, কিন্তু সে বেশী দিন নয়। ক্রমে বুঝিলাম যে, আমি দেবতা ফেলিয়া পশুকে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছি ; সোণা ফেলিয়া আঁচলে গেরো বাঁধিয়াছি। প্রাণে আগুণ জ্বলিল—কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি তাহা পলে পলে অনুভব করিতে লাগিলাম। কিসে ঐ পিশাচের কবল হইতে উদ্ধার পাইতে পারি, তাহাই আমার একমাত্র চিন্তা ও প্রাণপণ চেষ্টার বিষয় হইল। আমি আমি অনেক নিম্নে নামিয়া গিয়াছিলাম, বিলাসিতার মোহে তখনও পুরামাত্রায় ডুবিয়াছিলাম, তবুও তাহার পৈশাচিক অত্যাচার

সহ্য করিতে পারিলাম না। আমার পাপীয়সী মা তখন মরিয়াছিল? কিন্তু সেই মৃত মাতার উদ্দেশে অভিসম্পাত বর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। উঃ! সে কি অসহ্য নরক যন্ত্রণা! বাবু আপনারা হয় তো মানিবেন না যে, আমরা ভগবানকে ডাকি। আমরা যদি না ডাকিব তো কে ডাকিবে; আমাদের মত হতভাগিনী জগতে আর কে আছে? ডাকি বৈকি; এক এক সময় বড় কাতর ভাবে প্রাণ ভরিয়া ডাকি—হে ভগবান্ কবে আমাকে নিস্তার দিবে—এ পাপ জীবন কবে শেষ হইবে! এই সময় বোধ হয় বড় আগ্রহে ভগবান্‌কে ডাকিয়াছিলাম—তাই তিনি মুক্তি দিলেন। আমি সেই নরকের কীটের হাত হইতে অব্যাহতি পাইলাম। তা পাইলাম বটে, কিন্তু ঐ সময় হইতেই জগতের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা জন্মিল; মানুষকে দেখিলে যেন ভয় হইত। কেবল গেল না বিলাস-বাসনা, ওটা যেন আমার প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল।

দিনকতক বড় কষ্টেই কাটিল—কিন্তু তার পর আমার সঙ্গীত-নিপুণতার ও নৃত্যকুশলতার প্রচার হইতে লাগিল। ঐ সকল গুণের উপর আমার রূপ ছিল—কাজেই অল্প দিনের মধ্যেই বাবু মহলে আমার বেশ পসার জমিয়া গেল। আমায় দুঃখ কষ্ট রহিল না—ফের বেশ বাবুয়ানি চালেই চলিতে লাগিলাম। ভগবানের ইচ্ছায় এখন আমার আর অর্থের অনাটন নাই, তবে মিছে আপনার অর্থ শোষণ করি কেন? আর কি জানেন—এখন আমি আমার শিল্পকে ভালবাসিয়াছি—ঐ শিল্পকলাই এখন আমার সর্ব্বস্ব, ইহার উন্নতির জন্যই এখন আমার সারা চেষ্টা, সারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, বেশ বুঝিয়াছি যে সঙ্গীতচর্চ্চা ও কামের চর্চ্চা—একসঙ্গে হয় না। যদি কামের চর্চ্চা করিতে যাই তাহা হইলে আমার—সর্ব্বজন লোভনীয় সুর খারাপ হইয়া যাইবে। মানুষকে কখনও প্রাণ দিতে পারি নাই—এই সঙ্গীত বিদ্যাকে দিয়াছি, অতএব

উহার যাহাতে ক্ষতি হয়—তাহা আমি প্রাণান্তেও করিতে পারি না। আপনারা বিলাতী ধাঁজের লোক—আপনারা সঙ্গীত-শিল্প বলিলে হয় তো বুঝিতে পারিবেন না, আমার মত লোকের মুখে হয় তো ও কথা সাজে না, কিন্তু যদি বলি যে আমি এখন একজন artist আমি আমার আর্টকে ভালবাসি তাহা হইলে বিলাতে অমন হয় জানিয়া আপনি কতক তাহা বুঝিতে পারিবেন। যাহা হউক, এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন যে, আপনার কলুষিত বাসনা চরিতার্থ করা আমার কর্ম্ম নয়, এবং কেন আপনাকে নিরাশ করিয়াছি। শুনিয়াছি, আমাদের দেশে আগে art শিল্পের আদর ছিল, শিল্প ছাড়িয়া শিল্পীকে কেহ চাহিত না, এখনকার লোক গুলা শিল্প ফেলিয়া দিয়া কেবল শিল্পীর দেহটা লইয়াই ব্যস্ত, তাই আমাদের দেশ হইতে শিল্পকলা উঠিয়া যাইতেছে। আমরা তো হীন প্রাণ, কত দিন প্রলোভন এড়াইতে পারি? আমাদের চতুর্দ্দিকে এই প্রলোভন ছড়ান রহিয়াছে, যে এই প্রলোভন এড়াইতে পারে, সেই যথার্থ শিল্পী হইতে পারে। আপনি জানেন কিনা জানি না, আমারই মত কোনও একজন শিল্পের খাতিরে পঞ্চাশ হাজার নগদ এবং ভবিষ্যতের পাকা বন্দোবস্ত প্রত্যাখ্যান করিয়া অতিশয় শিল্পের ভক্ত হইয়াছিল, কিন্তু সেও শেষে প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারে নাই। এই তো আমাদের মন—কেন তবে আমাদের সম্মুখে প্রলোভন আনেন? ইন্দ্রিয়সেবায় যে সুখ তা তো দেখিয়াছি—আর কেন?

আর একটা কথা বলিয়াই শেষ করিব। আমি আজন্ম বারাঙ্গনা নই, আমার একটী মধুর স্মৃতি আছে, আজ্ এই হীন জীবনে সেই স্মৃতির পূজা করিয়া কাটাই—ইহার চেয়ে সুখ আর আমার নাই। ঐ এক স্মৃতির পূজায় জীবন কতক পবিত্র হয়, বোধ হয় ইহাতেই আমার ভগবানের নাম উচ্চারণ করিবার শক্তি ও অধিকার আসে, আর ইহারই

জন্য সামান্য কামচর্চ্চা আমার কাছে তিক্ত বোধ হয়; একথা বিশ্বাস করিতে পারিবেন কি? আমাদের যে কিছু ভাল থাকিতে পারে, তাহা যে কামুক পুরুষ আপনারা বিশ্বাস করিতেই চাহেন না। শেষ কথা —আপনার জন্য এতটী পবিত্র-হৃদয় বুকজোড়া ভালবাসা লইয়া আপনার অপেক্ষায় আকুল প্রাণে বসিয়া আছে; আপনি তাহাকে কষ্ট দিয়া বারাঙ্গনার লালসায় উন্মত্ত হইয়া নিজের ও তাহার সর্ব্বনাশ করিবেন না। ঘরে ফিরিয়া যান—এই অতি হীনা রূপব্যবসায়িনীর কথা মন হইতে মুছিয়া ফেলুন, আপনার মঙ্গল হইবে। আমি নিজের অনুভূতি হইতে এ কথা বলিতে সাহস করিতেছি, নচেৎ আমি একটা ক্ষুদ্র পতিতা নারী আপনাকে উপদেশ দিবার আমার কোনও অধিকার বা প্রবৃত্তিও নাই।

আপনি ব্রাহ্মণ আপনাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লই। ইতি

বিনীতা

সুনীলা বাই।

৮

সুহাসিনীর কথা।

ডায়রী ১৫ই বৈশাখ।

"এ মানুষ গেল কোথায়? বলে গেলেন দুদিনেই ফিরে আস্‌ব, আজ্‌ও এলেন না কেন? কে জানে বাবু, তাঁর উপর তো বিশ্বাস নাই; কোনও কুসঙ্গে প'ড়ে যে কি করবেন তাও তো জানি না, আমোদ পেলে তো আর নিস্তার নেই। ওঁর সকল গুণ—ঐ দোষটীতেই মাটী ক'রেছে—মদ পেলে যেন কি হ'য়ে যান। কে জানে অসুখ বিসুখ তো করে নি? কল্‌কেত্তা সহর—সেখানে তো আজকাল সয় না, এ ভাল জায়গায় থেকে কেমন অভ্যাস ধ'রে গেছে, আমাদের কারুর আর সেখানে দেহ ভাল থাকে না। তা কল্‌কেত্তায় তো প্রায়ই যান, এত দেরি তো কোনও বারই হয় না। চিঠি লেখালুম তারও কোনও উত্তর নেই—কি ব্যাপার?"

অক্ষয় বাবু আমাদের মুরুব্বি, তাঁহার পত্নী আজ্‌ আমাদের বাড়ী বেড়াতে এসেছেন, আমি তাঁহারই কাছে আমার মনের সন্দেহ ব্যক্ত করিতেছিলাম। স্বামী আজ্‌ আট দিন কলিকাতায় গিয়াছেন, তাঁহার অনেক দিন আগেই ফিরিয়া আসিবার কথা, কিন্তু তিনি আজ্‌ও এলেন না, তাই মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি আমায় বুঝাইয়া বলিলেন—"কেন বোন্‌ তিনি তো এ কয় বছর বেশ সাম্‌লেই চ'ল্‌ছেন; তোমার এত ভয় কিসের? আর খাবার সময় তো তাঁর শরীরে কোনও

"অসুখ ছিল না, অসুখই বা তবে হবে কেন? তা কিছু নয়, কোনও কাজে আট্‌কা প'ড়ে গেছেন, তাই দেরি হ'চ্চে, তুমি ভেব না।"

হায় সরল-হৃদয়া নারী! তুমি তো জান না যে, আমি তাঁর কি মূর্ত্তি দেখিয়াছি; মদে তাঁহাকে কেমন করিয়া দেয় তাহা তো তুমি জান না তাই তোমার ভাবনা নাই, কিন্তু আমার মনে যে অহরহঃ সেই ভয়ই জাগিয়া আছে, পাছে তিনি আবার বাড়াবাড়ি করেন। উঃ! সে সব কি দিনই গিয়াছে! ভাগ্যে অভয় ছিল তাই আমার একটুখানি সাহস ছিল, নচেৎ আমি ভয়ে বোধ হয় পাগল হইয়া যাইতাম। মানুষ যেন সে মানুষই নয়—নেশায় যে মানুষ কত বদলাইয়া যায়, তা আমি ভাল করিয়া বুঝিয়াছি। মর্ম্মে মর্ম্মে আমার সে সব দৃশ্য গাঁথিয়া গিয়াছে। অথচ সহজ অবস্থায় ঐ মানুষই যেন অন্য মানুষ হইয়া যাইতেন; সে কত আপ্‌শোস, কত ভালবাসা, কত আদর, কত সোহাগ। মানুষ যেন কাগজের মত সাদা, কোন খল কপটতা নাই, প্রাণে কোনও প্যাঁচ্ নাই; তখন আমিই তাঁহার সর্ব্বস্ব, তাঁহার হৃদয়ের নিধি; আর যেই মদের মাত্রা বেশী হইল, অমনি যেন পাগ্‌লামির পালা পড়িয়া গেল। সে কি বকাবকি, কি নাচুনি, এ সব কথা মনে আসিলে এখনও হাত পা পেটের ভিতর ঢুকিয়া যায়। বলিয়াছি তো—পুরাণ চাকর অভয় না থাকিলে যে আমি কি করিতাম তাহা এখন ভাবিয়াই পাই না। যদি খুকী খোকা না হইত, তাহা হইলে হয় তো আমি পাগলই হইয়া যাইতাম। ঐ গুলির মুখ দেখিয়া আমার তাপিত প্রাণ যেন জুড়াইয়া গেল, তাহাদের জন্যে জীবনে কতখানি যে আস্থা বাড়িয়া গেল, তা এখন বলিয়া আর কি জানাইব। আমি হিন্দুর মেয়ে, আমার পতিই সার, পতিই দেবতা; আমার হৃদয়ের যা কিছু ভালবাসা ছিল, তা তো তাঁর উপরই গিয়া পড়িয়াছিল, তাঁকে ভিন্ন তো আমি আর কিছুই

জানিতাম না; তবে আমার এ ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভালবাসা কি তাঁহার মনোমত হয় নাই, ইহাতে কি তাঁহার মন ভরে নাই? তা না হইলে তিনি আমাকে ফেলিয়া মদের নেশায় মত্ত হইতেন কেন? কে জানে? পুরুষগুলার প্রবৃত্তিকে ধন্য! কে জানে ইহারা রত্ন ফেলিয়া কাচের আদর করে কেন? ঘরে অমৃত থাকিতে বাহিরে বিষের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায় কেন? এ মানুষটাকে আমি বুঝিতে পারিতাম না। সজ্ঞানে যেন আমা ছাড়া আর কিছুই জানেন না, কিসে আমি সুখে থাকিব, কিসে আমার মনে স্ফূর্ত্তি হইবে, তখন সেই চিন্তাতেই ব্যস্ত, ভাল বাসেন বৈকি! তা না বাসিলে ইহার জন্যই বা তাঁর মাথা কেন হইত? তিনি তো ইচ্ছা করিলেই একেবারেই আমার পানে না তাকাইতেই পারিতেন। তাতো কখনই করেন নাই, বরং তিনি যে আমায় ভালবাসিতেন তাহা আমি তাঁহার কথাবার্ত্তায়, কাজে, বেশ জানিতে পারিতাম। অথচ তাঁহার চরিত্রে ঐ দোষ কোথা হইতে আসিল? ভগবান্ যে কোন্ ধাতুতে মানুষ গড়িয়াছেন তা বুঝা ভার। মানুষ কেনই বা কখনও দেবতা কখনও পশু আবার কখনও সহজ মানুষ তা কে বুঝাইয়া দিতে পারে? প্রথম জীবনেই আমার প্রাণে অশান্তি আসিল কোন্ কর্ম্মের ফলে তা কে জানে? না জানি, পূর্ব্বজন্মে কত পাপই করিয়াছিলাম, তাহারই ফলে জীবনের আরম্ভেই ঐ দুশ্চিন্তা, ঐ অশান্তি আসিয়াছিল। কে জানে—আমিই হয় তো ভালবাসা দিতে পারি নাই—হয় তো তিনি যত চাহিতেন তাহা দিতে পারি নাই, অথবা তিনি যেমনটী পছন্দ করিতেন তেমনটী হইতে পারি নাই। আবার ভাবি তাই বা কৈ? কোনও দিন তিনি তো বলেন নাই যে, আমি তাঁহার মনের মতন হইতে পারি নাই—সে কত আদরে আমায় লেখাপড়া শিখাইতেন, নিজে সাহেবিয়ানা করিয়াও আমাকে



কথনও বিবিয়ানা করিতে বলেন নাই, অথবা আমার হিন্দুয়ানিতে কোনও দিন অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। আমি নিজের মতেই সংসার গড়িয়াছিলাম, আমি নিজের মতেই ছেলে মেয়ে মানুষ করিয়াছিলাম, কোনও দিন তিনি তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই, আমার সাজান সংসার কোনও দিন ভাঙ্গিবার চেষ্টা করেন নাই—কেবল ভাঙ্গিতেছিলেন নিজের জীবনটা, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণটা। তাঁহাকে কোনও দিন ঘৃণা করিতে শিখি নাই সত্য, কিন্তু মদে তে চিরকাল ঘৃণা ছিল,—প্রথম প্রথম তাঁহাকে মাতাল অবস্থায় দেখিয়া কোনও একটা অসুখ হইয়াছে ভাবিয়া কতই কাঁদিতাম, ক্রমে বুঝিতে পারিলাম যে ও অসুখে ভাবনায় কাঁদিতে হয় না বটে, তবে কাঁদিতে হয় নিজের অদৃষ্ট ভাবিয়া—সে কান্নাও অনেক দিন কাঁদিয়াছি—শেষে অদৃষ্টের দোষ ভাবিয়া শান্ত হইয়াছি। তাঁহাকে যদি ভাল না বাসিতে পারিতাম, অথবা যদি মনে হইত যে, তিনি আমাকে একেবারেই ভাল বাসেন না, মোটেই দেখিতে পারেন না, তাহা হইলে বোধ হয় অত কাঁদিতে হইত না; কিন্তু হিঁদুর মেয়ে আমি স্বামীর পায়ে প্রাণ সঁপিব না তাও কি হইতে পারে, যে তা পারে সে তো স্ত্রী নয়—সে রাক্ষসী।

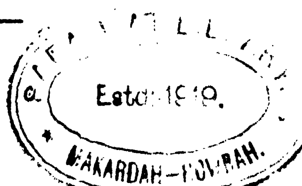
তার পর তাঁর চাকরী গেল—এখন দেখিতেছি তাহাতে মঙ্গল হইল, কিন্তু সে সময়টা বড় মন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তাঁর যে মাথা হেঁট হইল, আমার হৃদয়ে যে অটল স্বামীগর্ব্ব ছিল—আমার স্বামী শিক্ষিত, উচ্চপদস্থ, সে গর্ব আমার ছিল বৈকি—তাহা যেন সব চুরমার হইয়া গেল, সে সময় বড় কাঁদিয়াছিলাম, বড়ই নিরাশ হইয়াছিলাম, ভগবান্ যে অদৃষ্টে আরও কত কষ্ট লিখিয়াছেন তাহা ভাবিয়া আকুল হইয়াছিলাম। কিন্তু সে দুর্দ্দিন আসার পরিবর্ত্তে, সেই শুভদিন হইতে আজ্ পর্য্যন্ত তিনি সাম্‌লাইয়া চলিয়াছেন—একি কম সৌভাগ্যের কথা। ভগবান্ যে কোন্ ঘটনা

হইতে কি ফল আনেন তাহা যদি আমরা বুঝিতে পারিতাম তাহা হইলে জগতে অনেক শান্তি থাকিত। বলিতে কি, এই কয় বৎসরে তিনিও যেমন নূতন মানুষ হইয়াছেন, আমিও তেমনি নূতন হইয়াছি; তাঁরও যত আনন্দ ফুটিয়াছে, আমোদ উছলিয়াছে, আমারও তেমনি তাঁহাকে বাঁধিবার প্রযত্ন দ্বিগুণ হইয়াছে। এই কয়টা দিনই আমার জীবনের চরম সুখের দিন। ভগবান্ কি সে সুখের দিন চিরস্থায়ী করিবেন না? পাপীয়সীর অদৃষ্টে কি স্বামী সুখ অখণ্ড হইবে না? সন্তানগণের উন্নতি দেখা অদৃষ্টে সহিবে না? কে জানে—কেন মনটা একটা অব্যক্ত আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে? ভগবান্ করুন যেন আমার এ আশঙ্কা অমূলক হয়, যেন যেমন মানুষটী গেছেন, তেমনি যেন ফিরিয়া আসেন। মন বড় অনিষ্টাশঙ্কী হইয়া পড়িয়াছে—এত সুখ, এমন স্বামীর ভালবাসা, এমন অর্থ স্বচ্ছলতা, এমন সন্তান-ভাগ্য আমার কি সহিবে, আমি কি তেমন পুণ্য করিয়াছি? আমার কি তেমন কোনও গুণ আছে যাহাতে আমি আমার আমোদপ্রিয় পতিকে চিরদিন আমার অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিতে পারিব? তিনি এত দেরি করিতেছেন কেন? কখনও তো এত দেরি হয় না, আর এত দেরি হইতে পারে—তাহাও তিনি বলিয়া যান নাই। কলিকাতা পাপস্থল, কে জানে তাঁহার কোনও বিপদ হইল না কি? মনটা আমার এত অস্থির হইতেছে কেন? বিশেষ ভাব্বার বিষয়—চিঠি লিখিলাম তাহার উত্তর পাইলাম না কেন? দু দিনের জন্য গিয়াও তো চিঠি না লিখিয়া থাকেন না, এবার এমন কেন হইল? মনের উপর একটা বিপদের অমঙ্গলের ছায়া যেন স্পষ্ট আসিয়া পড়িতেছে—ইহার হাত হইতে কেমন করিয়া নিষ্কৃতি পাই? মনের ব্যাকুলতায় অভয় বাবুর স্ত্রীকে বলিলাম যে, এক খানা "তার" করিয়া দিলে হয় না?—তাঁর কলিকাতার বাসায় "তার" করিয়া খবর লওয়া মন্দ

কি? তিনি তাহাতে সম্মত হইলে আমি বলিলাম যে, আমি অভয়কে পয়সা লইয়া পাঠাইয়া দিতেছি, তারি হাতে "তার" লিখিয়া দিলে সে করিয়া দিবে, এখানে তো লিখিবার কেহ নাই। তাঁহার সঙ্গে অভয়কে দিলাম। আহা, কত স্নেহ ঐ রমণীর হৃদয়ে! আমাদের প্রতি তাঁর কত টান, যেন আমি তাঁর আপনার জন, বুঝি আপনার জনেও এত যত্ন করিতে, এত স্নেহ দিতে পারে না।

অভয় আসিয়া খবর দিল "তার" করা হইয়াছে। "তার" করাও একটা বিষম যন্ত্রণা—যতক্ষণ না উত্তর আসে ততক্ষণ যেন প্রাণ আই ঢাই করিতে থাকে—শয্যাকণ্টকী ধরে। আমারও সেই অবস্থা হইল। যদি কোনও মন্দ সংবাদ আসে, এই ভাবনাই মনে ক্রমাগত উঠিতে লাগিল। যন্ত্র-চালিতের মত ঘরের কাজগুলা করিয়া যাইতে লাগিলাম। মন পড়িয়া রহিল সেই তারের পিয়নের আগমনের উপর। অল্প কিছু শব্দ হইলেই ছেলেদের পাঠাইয়া দিই—ঐ বুঝি "তার" আসিল। এমনই করিয়া সমস্ত দিনটা কাটাইলাম। সন্ধ্যার সময় উত্তর আসিল—"আমি ভাল আছি—কাল রওনা হইব।" ঘাম দিয়া যেন জ্বর ছাড়িল, রাত্রে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারিব। নারায়ণ আমার আশঙ্কা যেন সব মিথ্যা হয়—যেন সংসারে আর তাঁহার চরণে কুশাঙ্কুরও বিদ্ধ না হয়।

——০——



৮

সতীশের কথা।

"আবার মূষিক হইলাম। রক্ত মাংসের নেশা কাটাইয়া আবার ঘরে ফিরিলাম। এ জীবনে নভেলিয়ানা করা আর হলই না। লাভের মধ্যে যে অভ্যাসটা এত দিন দমন করিয়া আসিতেছিলাম, সেইটা আবার ভাল রকম ধরিয়া গেল। বাড়ীতে কি কৈফিয়ৎ দিব সেই ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিলাম; কারণ, যেদিকে যাই সে বড় কঠিন ঠাঁই—আঁত যে সেই খানে! সেখানে বড় ভয়ে ভয়েই চলিতে হইত। এ কথা শুনিয়া হয়তো অনেকে হাসিবেন—হাসিবার কথা বটে, আমি একটা গোরা দস্তুর লোক, আমি কিনা বিলাতী কায়দায় যাহাকে household drudge (ঘরের দাসী) বলা যায়, তাহার কাছে ভীত, তাহার কাছে এত দিনের অকারণ অনুপস্থিতির কি কৈফিয়ৎ দিব, তাহার চিন্তায় ব্যাকুল। তা ভাই rationalist (যুক্তি সর্ব্বস্ব) আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের, যে নামে ইচ্ছা হয় তাহাতেই অভিহিত কর, য মুখে আসে তাই বলিয়াই বক্তৃতা কর, বড় বড় প্রবন্ধ লেখ, কিন্তু সত্য টুকু গোপন করিও না। ছেলে বেলায় মা'র আঁচল ধরিয়াছিলে, যদি বিবাহ করিয়া থাক তাহা হইলে সারা জীবনটা পত্নীর আঁচল ধরিয়া কাটাইবে, এই সার সত্যটুকু লুকাইও না; তাই যদি না হইবে, তাহা হইলে স্ত্রীর খাতিরে বাঁধা ঘর ভাঙ্গিবার জন্য এত লালায়িত হইয়াছ কেন? আমি ভাই এইটুকু বুঝি—আমি যে চিরদিনই সাহেবিয়ানি ঢং করি, ধর্ম্মাধর্ম্ম মানি না, আরও কত কি ভড়ং করি, আমা হেন দুর্দান্ত

শাভেল, আমিও ঐ খানে কাবু; ঐ পুণ্যময়ীর জ্যোতির কাছে আমার পাপ-কলুষিত, বিলাতী-মত-পুষ্ট হৃদয় নম্র হইতে যেন বাধ্য হয়!

ঘরে আসিয়া পঁহুছিতে সুহাসিনী আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিল "বলি এত দিন ক'চ্ছিলে কি? একটা খবরও কি দিতে নেই, আমি যে কত ভাবনায় প'ড়েছিলাম তা কি একবার ভাব্‌তে বারণ ছিল? ব্যাপার খানা কি?" ইহার উত্তরে পুণ্যের কাছে পাপের যা চির-প্রচলিত রীতি, আমি তাহাই করিলাম—সাফ্‌ মিথ্যা কথা বলিলাম,—"কি জান একটু কাজও প'ড়ে ছিল, আর শরীরটাও তত ভাল ছিল না, তাই ফির্‌তে একটু দেরী হ'য়ে গেছে—তা বাড়ীতে সব ভাল তো? অভয়, এক ছিলিম তামাক চড়া, আর এক পেয়ালা চা তৈয়ার ক'রে নিয়ে আয় তো?"

এ যাত্রা ইহাতেই নিস্তার পাওয়া গেল, তার পর সে আমার চায়ের ও জলযোগের আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল ও কলিকাতার পাঁচ কথায় ভুলিল, অতএব আমার আগমন আপাততঃ শুভাগমনেই দাঁড়াইল। এতদিন পরে ঘরে আসিলাম, স্ত্রী পুত্র কন্যার মুখ দেখিলাম, অনেকটা শান্তি আসিল, এটা ঠিক—কিন্তু এটাও ঠিক, যে, কলিকাতায় থাকিবার কালে যে কুস্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, সেই স্বপ্নের স্মৃতি প্রাণে মাঝে মাঝে খুব জোরেই ধাক্কা দিতেছিল। সুনীলার রূপের ও গীতের স্মৃতি, কে জানে কেন, তখনও আমার হৃদয়ে একেবারে বিলীন হইয়া যায় নাই। কেন এমন হয়? অনেকটা ইচ্ছা করিয়াই মানুষ এমন অনাসৃষ্টি অভাবের সৃষ্টি করে, কেন রূপের কি এতই প্রভাব—রূপের জয় কি সর্ব্বত্র? সুনীলা যদি প্রত্যাখান না করিত, তাহা হইলে কি আমি এই সুখের সংসার ভুলিয়া উহার রূপানলে জীবনটা সত্যসত্যই আহুতি দিতাম? তা রূপের জন্য যদি পুড়িয়া মরিতাম, তাহা হইলেও তো একটা কিছু

বলিবার থাকিত, রূপের জন্য ট্রয় ধ্বংস হইয়াছিল, আমার মত ক্ষুদ্র প্রাণী না হয় ধ্বংসই হইত। কিন্তু আমি সেই ধ্বংস হইলাম, কিন্তু এটাও আমার বলিবার রহিল না যে, কি করিব; রূপ দেখিয়া বড় বড় ঋষি তপস্বী অধীর হইয়া তপস্যা ত্যাগ করেন, তো আমি কোন্ ছার? যাক্। আমি যে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইতেছিলাম তাহা আমার সূক্ষ্মদর্শিনী পত্নীর দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। সে আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাগা. আজ্‌কাল তোমাকে যেন আনমনা দেখি কেন?" আমি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সে কথাটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলাম বটে, কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, তাহার মনে একটু সন্দেহের ছায়া পড়িয়াছে, আমার মনে যে কোনও একটা চিন্তার হেতু উপস্থিত হইয়াছে, তাহা যেন সে বুঝিয়া ফেলিয়াছে। অথচ মুখ ফুটিয়া সে কথা সে কখনও প্রকাশ করিয়া বলে না বা বলিতে চাহে না। আমি কাজ কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছি, মক্কেল আসিতেছে, টাকা আসিতেছে, আগেকার মতই সব চলিতেছে, কেবল রাত্রে মদের মাত্রা একটু বাড়িয়াছে, এবং সকালেও একটু করিয়া মদ্যপান আরম্ভ হইয়াছে। এই বইতো নয়— তা ইহার জন্যই বা বিশেষ ভাবিবার কথা কি? শরীরটা কলিকাতায় গিয়া একটু অসুস্থ হইয়াছিল কিনা, তাই গায়ে বল পাইবার জন্য সহজ অবস্থার অপেক্ষা একটু বেশী মাত্রায় খাই, ইহার অছিলায় গণ্ডগোল বাধাইবার কি কারণ হইতে পারে?

যখন এই অবস্থায় দিন যাইতেছিল, তখন আমার পরিবারের মন অন্য একটা বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে নিমগ্ন হইল। আমার কন্যা শোভাই আমাদের জ্যেষ্ঠ সন্তান, এই সময় তাহার বিবাহ সম্বন্ধ হইল। সম্বন্ধটা ভাল, অতএব অনেক বিবেচনার পর আমরা ঐ পাত্রে কন্যা সমর্পণ করিতে কৃতসংকল্প হইলাম। হিন্দুপরিবারের ব্যবস্থামতে তাহার

বিবাহের বয়স হইয়াছিল, আমার নিজের ইচ্ছায় কাজ হইলে হয় তো আমি আরও দু এক বৎসর বিলম্ব করিতাম, কিন্তু স্ত্রীর একান্ত ইচ্ছা এমন ভাল সম্বন্ধ ছাড়া হইতে পারে না, অতএব আমাকে তাহারই ইচ্ছানুযায়ী বিবাহ দিতে সম্মত হইতে হইল। তা ভাই, সংস্কারক আমি ঐটুকু বলিয়াই খালাস, তোমরা ইহার উপর যতটা রং ফলাইয়া বক্তৃতা করিতে পার করিয়া লও। এই ব্যাপারে আমার স্ত্রীর মনে এত আনন্দ ও উৎসাহ আসিল যে, সে আর সব কথাই ভুলিয়া গেল। আমিও যথাসাধ্য বিবাহের উদ্যোগে ব্যাপৃত হইলাম। বিবাহ হইয়া গেল। কন্যাটি সৎপাত্রেই পড়িল বলিয়াই তো বোধ হয়, তবে তাহার উপর বিশ্বাস কি? দেখ যখন বিবাহ করি, তখন আমিও তো সৎপাত্র বলিয়াই গণ্য হইয়াছিলাম। আমার শ্বশুর মহাশয় তো তখন বুঝিতে পারেন নাই যে, তিনি হাত পা বাঁধিয়া মেয়েটীকে গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিতেছেন। আমার অদৃষ্টেই বা কি আছে তা কে জানে? এ পর্য্যন্ত কিন্তু আমার এই সুখ যে, মেয়েটীকে সুখী দেখিয়াই মরিতে পারিতেছি। জামাই বি, এ পড়ে, ভদ্রঘরের ছেলে, স্বভাবচরিত্রও ভাল, ধীর ও নম্র। বাহ্যতঃ এই পর্য্যন্ত দেখিয়া শুনিয়া লইয়াছিলাম। পরে কন্যার অদৃষ্টে কি লেখা আছে তাহা আর আমায় দেখিতে হইবে না, এই আমার শান্তি।

কন্যা লইয়া আবার কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া আসিলাম। আবার এক ভাবেই কিছুদিন সংসার চলিতে লাগিল। কেহ যদি মনে করিয়া থাকেন যে, কন্যার বিবাহান্তে শ্বশুর পদে অধিষ্ঠিত হইয়া আমি মদ্যপান কমাইলাম, তাহা হইলে তাঁহার ভুল হইবে। আমার মদ্যপান সমভাবেই চলিতে লাগিল। তখনও যে মাত্রায় পান করিতেছিলাম তাহাতে আমার ব্যবসায়ের ক্ষতি করিতে পারে নাই, আমার তখনও কাজে কিছুমাত্র বেতাল হইত না; আমার বেশ নাম হইয়াছিল,

আমি একজন ভাল উকীলের মধ্যে গণ্য হইয়াছিলাম। আমার অনেক মক্কেল হইয়াছিল; উপার্জ্জনও বেশ হইতেছিল। কন্যার বিবাহে আমি যথাযোগ্য ব্যয় করিয়াছিলাম, কাহাকেও অসন্তুষ্ট করি নাই, কন্যা জামাতাকে ভালই দিয়াছিলাম। দেওয়া ব্যাপারটা ব্রাহ্মণ সমাজেও বেশ প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়াছে দেখিতে পাই; যিনি খুব স্বদেশী ইত্যাদি, তিনিও বিবাহের কালে কোনও এক অভিভাবকের দোহাই দিয়া বিলক্ষণ আদায় করিতে ছাড়েন না। সভ্যতার উপসর্গ! যাহা হউক, অত দিয়াও আমি কাহিল হই নাই, কারণ আমার পূর্ব্বের সঞ্চয়ও কিছু ছিল, ও তাহার পর দুপয়সা উপার্জ্জনও করিতে লাগিলাম, কাজেই সে দেওয়া আমার তত গায়ে লাগে নাই, কিন্তু কত লোক যে এই অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া আছে, তাহা কি কেহ দেখে? যাঁহারা যৌতুক লইবার বিপক্ষে বক্তৃতা করিয়া বেড়ান, তাঁহারাই নিজের বেলায় খুব দাঁও কসেন, এ দৃষ্টান্ত আমাদের সমাজে বিরল নয়। আবার, কেহ কেহ কাগজে ছাপাইয়া দেন যে, তিনি একপয়সাও যৌতুক লন নাই, কিন্তু বাছিয়া বাছিয়া এমন ঘরে পুত্রের বিবাহ দেন, যেখান হইতে এত দ্রব্য অযাচিত ভাবে আসিবে যে, তাহা নগদ যৌতুক লওয়ারও বাড়া—তা মেয়েটী মোটামুটী হউক তাহাতে ক্ষতি নাই। এই তো আমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের অবস্থা, অন্যান্য জাতিতে ইহারও উপর টেক্কা। ইহার প্রতীকার করিবার জন্য তো কাহাকেও ব্যস্ত দেখি না, বরং দিন দিন এ ব্যাধি বাড়িয়াই চলিয়াছে। তা আমার গায়ে না লাগুক, কিন্তু ফ্যাসানটা যে কতদূর গড়াইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম প্রথম জামাই-ষষ্ঠে। আজকাল গাড়ী করিয়া দ্রব্যসম্ভার না পাঠাইলে নাকি কাহারও মনঃপূত হয় না। ওটা এটা সেটা এইরূপ খুঁটিনাটি অনর্থক অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যই বা কত—এটা না দিলে ভাল দেখায় না, ওটা না দিলে

চলিবেই না, ইত্যাকার আদেশ গৃহিণী তো করিলেনই, এবং অন্যান্য সকল লোকেই তাহা সমর্থন করিতে লাগিল। সাধে কি একটী কন্যার বিবাহে সাধারণ গৃহস্থ সর্ব্বস্বান্ত হয়? উপায় ছিল—কাজেই গৃহিণীর ফরমাস-মত সবই যোগাইয়া জামাইকে প্রথম তত্ত্ব করিলাম নিখুঁত রকম। এ সব যে কি বাতিকে দাঁড়াইয়াছে, তাহা ভাবিবার কি কেহ নাই?

তারপর জামাই আসিল, মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী লইয়া গেল, আর জানিয়া গেল যে আমি মাতাল। এখন সে কথা জানিতে আর কাহারও বাকি নাই। আমার জনক জননী আমাকে কতক ভাল অবস্থায় দেখিয়া গিয়াছেন, ইহাই তাঁহাদের মনে শান্তির কারণ হইয়াছিল। দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া ঘরে যেমন একটা বিষাদের কালিমা পড়ে, আমার ঘরেও সেই রকম বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়িল; জামাই আসার যে আনন্দ উথলিয়াছিল, তাহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। গৃহিণীর মুখের হাসি শুকাইয়া গেল, মনে কত আশঙ্কাই জাগিতে লাগিল। আমি মদ্যপান করিয়া মনের দুঃখ ঢাকিবার চেষ্টা করিলাম। ইহাই সংসারের রীতি—আজ হাসি, কা'ল্ ক্রন্দন; ক্রন্দনের পাশে হাসি, হাসির পাশে ক্রন্দন, এই তো চিরকাল দেখিয়া আসিতেছি; তথাপি এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া মদ খাওয়ার বাড়াবাড়ি করিলাম।

আমি আজও বুঝিতে পারিলাম না, এ মদ খাওয়ার নেশা আমার কোথা হইতে আসিল—আমার বাপদাদা, ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশপুরুষে—কেহ কখনও মদ খায় নাই; আমার এ বিষম নেশা কোথা হইতে আসিল? এ জগৎ হইতে বিদায় হইতে চলিলাম, কিন্তু ইহার প্রথা এখনও কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অন্ততঃ আমার নিজের বিষয় আমি কখনও ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। মানুষ কি তবে কিছুই নয়—

কেবল একটা যন্ত্র মাত্র, যন্ত্রী যে ভাবে চালাইবে তেমনি চলিতে বাধ্য—নিজের তাহার কোনও শক্তি নাই? তবে ইহাই কি সত্য যে—

"Of all things that breathe the air and creep upon the Earth
The weakest thing that breathes and creeps on nurturing Earth is man,"

আমার চেষ্টা কি একটা কীটের চেষ্টারও অধম?

The blind and aimless strivings
The barren blank endeavours
The pithless deeds of the fleeting dream-like race."

সত্যই তো আমি অন্ধের মত ছুটিয়া চলিয়াছি—মনে মনে কত অভিসন্ধি করিতেছি, সব কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে। কি একটা অন্ধ শক্তি যেন আমায় অবিরত নিজের ইচ্ছামত চালাইতেছে—আমি নিস্তেজ হইয়া সেই পথেই ছুটিতেছি; কোনও কাজই এ সংসারে আসিয়া করিতে পারিলাম না, কোনও কাজের ইচ্ছাই স্থায়ী হয় না—দুরন্ত পবনের বেগে কুটার মত উড়িয়া যাইতেছি। নেশা ছুটিলেই বুঝি যে, ঐ যে ব্রীড়াসঙ্কুচিতা ললিত লবঙ্গলতা আমার ঘর আলো করিয়া আছে, উহার পায়ের বাতাসেই আমার মুক্তি, কিন্তু নেশার ঘোরে যেন দুনিয়া ফাঁক হইয়া যায়—জগতের কিছুই মনে থাকে না, এ কি প্রহেলিকা? যত মদ খাই, ততই এই সব চিন্তা প্রবলভাবে হৃদয়ে আঘাত করে, অথচ মদ্যপান তো বন্ধ করিতে পারিলাম না। এ সময়ে যদি কেহ এমন সুহৃৎ পাইতাম যে, আমায় এই কু-অভ্যাসের হাত হইতে উদ্ধার করিতে পারিত, তাহা হইলে আমাকে আজ এই অসময়ে মরণের মুখে আসিতে

হইত না, কিন্তু কৈ কেহ তো আসিল না। আমিই যে শক্তির গর্ব্ব করিয়াছি; মানুষ নিজেই নিজের অদৃষ্টবিধাতা বলিয়া দর্প করিয়া কাটাইয়াছি; কিন্তু এখন ক্রমে ক্রমে বুঝিতেছি যে, আমি কোনও এক অজ্ঞাত শক্তির হস্তে ক্রীড়ার পুত্তলি মাত্র, সে কখনও তাহাকে ভাল করিয়া সাজায়, আবার কখনও তাহাকে আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে।

৯

সতীশের কথা।

ক্রমে সকলেই জানিতে পারিল যে, আমি আবার অতিরিক্ত মাত্রায় মদ খাইতে আরম্ভ করিয়াছি। আমার অভাগিনী স্ত্রী এ কথা অনেক দিন হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিল—প্রায়ই সে আমাকে বলিত "এবার কলিকাতা হইতে আসা অবধিই যেন বাড়াবাড়ি দেখিতেছি, কেন বল দেখি? সেখানে এবার কি করিয়া আসিয়াছ? তোমার কিসের দুঃখ, কিসের অভাব যে, এমন করিয়া নিজের অনিষ্ট ও আমাদের মাথায় বজ্রাঘাতের চেষ্টা করিতেছ? এখনও শোধরাও, এখনও আগেকার মত সামলাও, বয়স হ'য়েছে, এখন কি আর এমন বাড়াবাড়ি শোভা পায়; জামাই হ'ল, দুদিন পরে নাতি হবে, এখন এ বয়সে লোকে ধর্ম্মকর্ম্মে মন দেয়, তুমি তা না কর, কিন্তু লোক লজ্জা বাঁচাইয়া কাজ করা কি তোমার উচিত নয়?" আমি সে সকল কথার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতাম, চেষ্টাও যে একেবারে না করিয়াছি তা তো নয়, কিন্তু সন্ধ্যা হইলেই যেন একটা প্রবল প্রচণ্ড আকর্ষণ আমাকে অবশ করিয়া ফেলিত, আমার নিজের ইচ্ছা বলিয়া আর কিছুই থাকিত না। আমি বুঝিতেছিলাম যে, এ প্রতিকূল দৈবের মুখে আমার সর্ব্বনাশ নির্দ্ধারিত হইয়াছে;—

Lost! I am lost, my fates have doomed my death
The more I shine......
The less I hope, I see my ruin certain.

কোথা হইতে কোন্ ঘটনার চক্রে যে আমার সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত

হইতে লাগিল, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই সময়ে আমি সাধ করিয়া আমার বাটীর বাউরি মালীর কন্যার বিবাহ দেখিতে চাইলাম। তাহারা বড় আদরে বড় যত্নে আমায় সেখানে লইয়া গেল। আমার বসিবার জন্য একখানা খাট আনিয়া দিল। এই বাউরীরা এখন অধিকাংশই হিন্দু আচরণ গ্রহণ করিয়াছে—বিবাহের অঙ্গ অধিকাংশই হিন্দুভাবাপন্ন; তবে ইহাদের বিবাহের বিশিষ্টতা এই যে, অন্যান্য পর্ব্বের মত ইহারা এই উপলক্ষে নৃত্যগীতে মগ্ন হয়, এবং প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করে। ইহাদের "ঝুমুর" নৃত্য বেশ আমোদজনক। ইহারা এখন বাঙ্গলা কথা কয়, বাঙ্গলা গান গায়—

ও সাঁঝের বেলা কদমের ফুল
ফুল কোথা পেলি লো।

ইত্যাদি গানের সঙ্গে ঝুমুর নৃত্য। ঐ নৃত্যও বিহার অঞ্চল হইতে গৃহীত, বিদ্যাপতির গানে ঝুমুরের বর্ণনা আছে। যাহাই হউক, আমার গান নাচ বেশ লাগিতেছিল। যাহারা মদ খায় না তাহাদের ওখানে টেঁকা বড় শক্ত, কারণ, মদের গন্ধে ঐ স্থান আমোদিত। আমার সে গন্ধ মিষ্ট লাগিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে মদ খাইবার প্রবল বাসনা মনে উঠিতেছিল। আঘ্রাণ হইতে আস্বাদনের স্পৃহা বলবতী হইতেছিল। তা কুপ্রবৃত্তির প্ররোচনা আসিলে তাহা পূরণ করিতেই বা কতক্ষণ? আমি মদ চাহিয়া খাইলাম; আবার ভাল মদ আনাইয়া পান করিলাম। ক্রমে নেশা জমিয়া উঠিল, ঐ অসভ্যদের আনন্দে পূর্ণমাত্রায় যোগদান করিলাম, তাহাতে কিছুই বাধিল না, কারণ আমার উদরে যে তরল মহামন্ত্র পড়িয়াছিল, তাহার গুণে সব একাকার হইয়া গেল. একেবারে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলাম বলিলেই চলে। এত মাতাল হইলাম যে চলিয়া

বাড়ী ফিরিবার অবস্থা রহিল না ; উহারা আমায় ধরাধরি করিয়া বাড়ী রাখিয়া গেল। শুনিয়াছি—সে রাত্রে অনেক উৎপাত করিয়াছিলাম, সকলের মনে ধিক্কার আনিয়া দিয়াছিলাম। সে সব কথা লিখিয়া জানাইয়া আর কি হইবে ; সকল মাতালই যা করিয়া থাকে আমিও তাহাই করিয়াছিলাম, তাহা কেই বা না জানে ? যদি কেহ না জান তো যোগেশের চিত্র পড়িয়া দেখ, আমার এ সব কীর্ত্তি সেই চরিত্রে পরিস্ফুট দেখিতে পাইবে। আর বলিবই বা কি ? আমার কি কিছু বলিবার আছে ? এই টুকু বলিতে পারি যে, সেই দিন আমার জীবনের সমাধি হইল, সেই দিন হইতে আমি মনুষ্যসমাজের বাহিরে চলিয়া গেলাম ; ইহজীবনে আর কখনও মানুষ হইতে পারিলাম না ; আমি মদ খাইলাম না, মদেই আমাকে খেলে, এতদিন নামেও অন্ততঃ ভদ্রলোক ছিলাম, সেই দিন হইতে হইলাম জগতের মধ্যে ঘৃণিত জীব—মাতাল। হায় নিয়তি ! এই কি আমার শিক্ষার—বুদ্ধির—কবিত্বের পরিণাম ? এ হতভাগ্য দেশে কত লোকই আমার মত এমন করিয়া জীবন নষ্ট করিয়াছে, কত প্রতিভা জগতের বুকে বিদ্যুতের রেখার মত ক্ষণিক আলোক ঢালিয়া অকালে নিভিয়া গিয়াছে, ভাবিলেও অস্থির হইতে হয়।

প্রভাতে যখন একটু নেশা ছাড়িল, তখন স্ত্রী আসিয়া অনেক অনুযোগ করিল ; ছেলে মেয়ের দোহাই দিয়া অনেক বুঝাইল, অনেক কাঁদিল। মাতালের যাহা দস্তুর আমি তাহাই করিলাম, মাতালের কান্না কাঁদিলাম, এবং হৃদয়ের ব্যথা শান্ত করিবার জন্য, লোকলজ্জার হাত হইতে এড়াইবার জন্যই, যেন আবার মদ খাইলাম। সেদিন আর আমার আদালতে যাওয়া হইল না, শক্তি থাকিলে তো যাইব ? এমনি প্রায়ই ঘটিতে লাগিল। বন্ধু বান্ধবেরা ও আমার সহযোগীরা অনেক বুঝাইল, কিছুতেই কিছু

হইল না। এই সময়ে, সত্য কথা বলিতেছি, আমি নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিতাম, কি সর্ব্বনাশ করিতেছি বুঝিতে পারিতাম, কিন্তু কি দারুণ সয়তানের টান—সে টান কাটিয়া উঠিতে পারি সে শক্তি আমার আর থাকিল কৈ? শুধু মক্কেল উকীলেরা যে জানিল আমি মদ্য পান করিয়া বিহ্বল হই তাহা নহে, ক্রমে হাকিমেরা জানিল যে, আমি ক্রমশঃ মাতাল হইয়া দাঁড়াইতেছি। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিতে লাগিল। মক্কেলেরা আমার কাছ হইতে ক্রমশঃ সরিতে লাগিল; আমি বাড়িতে মদ খাই, আদালতেও মদ খাই, সন্ধ্যার পর তো কথাই নাই, এমন অবস্থায় কেমন করিয়াই বা লোকে আমাকে বিশ্বাস করিয়া মোকদ্দমা দেয়—যাহারা আমার গুণে মুগ্ধ ছিল, তাহারাই তখনও আমাকে ছাড়ে নাই; তাহারাই তখনও আমাকে নিযুক্ত করিত। আমার তো মদ খাইলে হুঁস থাকে না, তো Case (মোকদ্দমা) করিবই বা কিরূপে?

শুধু বাড়ীতে বসিয়া মদ খাইলেও তো ছিল ভাল; আমি মাঝে মাঝে বাউরী গুলার সঙ্গে উধাও হইয়া যাইতাম; অনেক দিন বাড়ীই ফিরিতাম না, এমন কি, কত দিন সহর ত্যাগ করিয়া কোনও পল্লীর ভিতর গিয়া পড়িতাম, কেহ আমার সন্ধানই পাইত না। নীচ জনের সংসর্গে বেশ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলাম, তাহাদের আমোদ প্রমোদে নিঃসংকোচে যোগদান করিতে শিখিতেছিলাম, সঙ্গদোষে প্রবৃত্তি নীচ হইতেছিল। পেঁচা যেমন দিনের আলোক সহ্য করিতে পারে না, আমিও তেমনি আমার ঘরের পবিত্র স্নেহাদি সহ্য করিতে পারিতাম না, স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিতে ভয় হইত, সন্তানগণের প্রতি ফিরিয়াও চাহিতে পারিতাম না; তাহাদের দেখিলে মনে যে একটা দুশ্চিন্তা ও ক্লেশের সঞ্চার হইত, তাহা আমি প্রাণপণে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতাম। এখন ভাবনা এক রকম ছাড়িয়া দিয়াছি; আমি যে মানুষ হইতে পারিব না,

সে ধারণা মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। কেহ যদি আমার কর্ত্তব্যের কথা মনে করিয়া দিত, আমি তাহাকে বুঝাইয়া দিতাম যে, আমার প্রত্যাশা করা বৃথা; মাতালের প্রত্যাশা করা কেন? আর প্রত্যাশা করিলেই বা সে প্রত্যাশায় ফল কি? আমি আর নিজের কার্য্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিতেছি না। ছোট লোকের সঙ্গে মিশিয়া ছোট লোকের মত স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়া, এখন যখন তখন সকলকে গালাগালি করি; কেহ আর আমার সম্মুখে আসিতে সাহস করে না, স্ত্রী কেবল কাঁদে, ছেলেরা আমাকে দেখিলে ভয়ে কাঁটা হয়। আয় কমিতে লাগিল, মদ খাওয়া বাড়িতে লাগিল, আমার চরিত্রও তদনুপাতে নিকৃষ্ট হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে আমি কাজ করি, কিছু অর্থ উপার্জ্জন করি, যতদিন সেই অর্থ হাতে থাকে ততদিন মদ খাইয়া কাটাইয়া দিই; নীচ স্ত্রী-লোকের সহিত কুৎসিত আমোদে লিপ্ত হই, সংসারের প্রতি দৃক্‌পাতও করিনা। এমন করিয়া আর কত দিন চলিবে? তা কার্ কি ব'য়ে গেল? আমার কি গরজ? আমি মদ খাই, নাচি গাই বাস্, তোমরা সহ্য না করিতে পার—আমি তোমাদের চাই না; তোমরা আমায় ছাড়্‌বে কি আগিই তোমাদের ছাড়িয়া চলিয়াছি, যাহারা আমারি মত নাচে গায় মদ খায়, আমি তাহাদের লইয়াই থাকিব। কখনও কখনও মাতালের স্বভাব-সুলভ sentimentality (ভাবুকতা) আসিয়া আমাকে আচ্ছন্ন করিত, তখন কাঁদিয়াই আকুল হইতাম, স্ত্রীর হাত ধরিয়া কত অনুনয় বিনয় করিতাম, আমি কি ছিলাম, কি হইয়াছি ভাবিয়া মনে যত ব্যথা লাগিত, তত সুরাদেবীর কৃপা-প্রার্থী হইতাম; আবার পাগল হইতাম।

যত দিন পুঁজি ছিল, ততদিন পুঁজি ভাঙ্গিয়া কোনও রকমে সংসারও চলিল, আমার মদ খাওয়াও চলিল; তার পর মাতালের সংসারের নিত্য সহচর—অভাব তাহার বিকট বদন ব্যাদন করিয়া আমার সংসারে

প্রবেশ করিল। যাহারা দরিদ্র তাহারাই যে অসুখী তাহা নহে, তাহারাও যদি সজ্ঞানে থাকে, তাহা হইলে ঐ অভাব সত্ত্বেও কোনও রকমে দিন চালায়, যাহা আনে তাহাতেই কোনও রকমে চালাইয়া লয়। দারিদ্র্যের শত বিড়ম্বনা সহ্য করিয়াও তাহারা অটল থাকিতে পারে— যদি নিজের উপর বিশ্বাস থাকে, যদি কর্ত্তব্যের মুখ চাহিয়া কার্য্য করে— ঘরের লক্ষ্মীকে যদি লক্ষ্মীর মতই আদর করে, যথা সাধ্য যত্ন করে; তাহারা দরিদ্র কিন্তু পশু তো নয়, কাজেই হয় তো তাহাদের ঐ দারিদ্র্যের মধ্যেও সুখ আছে। কিন্তু আমার সংসারে দারিদ্র্যও আসিল, সঙ্গে সঙ্গে আমার পশুত্বও বাড়িয়া চলিল। যদি তখনও হুঁস আসে, তাহা হইলে হয় তো তখনও সাম্‌লাইতে পারি; আবার সবই ফিরাইয়া আনিতে পারি, আবার সংসার সুখের আবাস হয়; তা তো হইল না; হোক কষ্ট, আমার কি? আমি সমান ভাবেই মদের বশীভূত রহিলাম, আমাকে মদ দাও তা তোমরা খাও বা না খাও। কেমন করিয়া যে আমার মদ খাওয়া, আর পরিবারের ভরণ পোষণ চলিতেছে তাহা তখন একবারও ভাবি নাই। আমি যেন তেন প্রকারেণ কিছু টাকা পাইলেই তাহা লইয়া নিরুদ্দেশ হইতাম। লক্ষ্মী সরস্বতী উভয়েই আমাকে এক কালে ছাড়িয়া গেলেন; মদের প্রসাদে তীক্ষ্ণ মেধায় ঘুণ ধরিল, জিহ্বায় জড়তা আসিল। আমি যখন নিরুদ্দেশ হইতাম, তখন আমার সেই পুরাতন ভৃত্য আমার স্ত্রীর গহনা বিক্রয় করিয়া বা আস্‌বাব পত্র বিক্রয় করিয়া কোনও রকমে গ্রাসাচ্ছাদন চালাইত, আমার মদের খরচও যোগাইত। ক্রমে আমি পরের কাছে হাত পাতিতে লাগিলাম, ভিক্ষা করিয়া মদ্যপান চালাইলাম, কোথায় রহিল আমার আত্মাভিমান, আমার ভদ্রতা, আমার শিক্ষা? ছিলাম ভদ্রলোক—হইলাম ঘোরতর মিথ্যা-বাদী; কথা দিয়া কথা রাখা আর আমার দ্বারা হইয়া উঠিত না, ঋণ

বলিয়া লইয়া তাহা কখনও পরিশোধ করিতাম না। কত দিনই বা তাহারা আমার মদ্যপানের উপায় যোগাইবে? কেনই বা যোগাইবে? আমি কি দানের যোগ্য—আমি কি তাহাদের মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া চলিতেছিলাম? তবে অনেক দিন এক সঙ্গে কাজ করিয়াছি, অনেক দিন তাহাদের আমোদও দিয়াছি, সেই ভাবিয়াই তাহারা অনেক দিন ধরিয়া আমার ঐ নীচ প্রার্থনা পূরণ করিত ও করিয়া ছিল। উহাদের কাছে মদের পয়সা না পাইয়া আমি ক্রমে নীচ লোকের কাছেও হাত পাতিতে লাগিলাম; রীতিমত তাহাদের মদ্য-সহচর হইয়া দাঁড়াইলাম। উঃ কি নারকীয় প্রবৃত্তি! ঘরের লক্ষ্মী পায় ঠেলিয়া আমি কিনা এই অতি ঘৃণিত জীবগণের সঙ্গে ভিড়িয়া গেলাম। শুনিয়াছি, আমারই মত কোনও প্রবৃত্তি-চালিত ব্রাহ্মণ সন্তান একটা মেথরাণীর প্রেমে পড়িয়া মেতর হইয়াছিল, আমিও তো তাহাই হইলাম। মদের জন্য হাড়ি মুচি সকলেরই সঙ্গে মিশিলাম, নীচ স্ত্রীলোক সংসর্গ করিলাম। আমাকে দেখিলে লোকে ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করিত, মাতাল উকীল নাম বাজিয়া গেল, সকলে আমাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইত—মানুষের কত দূর পতন হইতে পারে, বোধ হয়, সকলে আমার দৃষ্টান্ত দিয়া অপরকে বুঝাইত।

———

১০

সুহাসিনীর কথা।

আজও আমার মরণ হইল না কেন? জানি না কত পাপে আমার এই বিষম যন্ত্রণা। যখন প্রথম প্রথম ঐ যন্ত্রণা সহিয়াছিলাম, তখন মনে হইয়াছিল, বুঝি এইরূপই বরাবর চলিবে, কিন্তু মাঝে আবার স্বর্গসুখের আভাস পাইলাম কেন? যদি পাইলাম তো তাহা স্থায়ী হইল না কেন? আমার যখন বিবাহ হয়, তখন বাপ মা মনে করিয়াছিলেন, সকলেই তাহাই মনে করিয়াছিল, যে, আমার অদৃষ্ট বড়ই সুপ্রসন্ন, এমন সর্ব্বগুণধাম স্বামী সচরাচর বাঙ্গালীর মেয়ের প্রায়ই ঘটেনা। আমিও সকলের কথা শুনিয়া ঐ কথাটাই সাব্যস্ত করিয়াছিলাম! কে জানে হয়তো পাঁচজনে আমার হিংসা করিত কিনা? তাহাদেরই চোখে চোখে কি আমার অমন স্বামীর এই দশা হইয়াছে; আমার এই ভিখারিণীর হাল হইয়াছে। স্বামী আজ কয়দিন নিরুদ্দেশ, এ নূতন নয়, এমন আজকাল প্রায়ই হইতেছে; স্বামী, আমাদের তত্ত্ব লওয়া এখন আর প্রয়োজন বলিয়াই মনে করেন না। আমি যে কি কষ্টে বাছাদের মুখে দুটী অন্ন দিবার ব্যবস্থা করিতেছি, তাহা ভগবান্‌ই জানেন। গাত্রের অলঙ্কার প্রায় সবই গিয়াছে; বাড়ীর আসবাব সাজ সজ্জা সবই গিয়াছে, দাসদাসী কেহ নাই, কেবল অভয় আছে; সে যাইতে চাহে না, কিছুতেই তাহাকে তাড়াইতে পারিনা; যাইবার কথা বলিলেই সে কাঁদে, বলে সে গেলে আমাদের দেখিবে কে? আমাদের অন্নের ব্যবস্থা কে করিবে? বাবু কি আর বাবু

আছে, সে যে খেপিয়া গিয়াছে, আর তার যে কোনও দিন চৈতন্য হবে, এমন আশা তো নাই। আমার মনে হয় যে, সে নিজ সঞ্চিত অর্থ হইতে আমাদের চুপি চুপি সাহায্য করে। সে এখন আমার পিতার মত অভিভাবক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে যদি না থাকিত, তাহা হইলে আমি হয় তো পাগল হইয়া যাইতাম, না হয়, আত্মহত্যা করিতাম। আমাদের যে কি অবস্থা হইয়াছে তাহা সেখানকার অনেকেই জানিতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এ দুরবস্থার কথা তখনও স্পষ্টভাবে আমার পিতা মাতাকে আমি জানিতে দিই নাই, কিন্তু তাঁহার বড় সাধের শিক্ষিত জামাই যে অতিরিক্ত মাত্রায় মদ খাইতেছেন, সে কথা না জানাইয়া তো থাকিতে পারি নাই। কি বলিয়া তাঁহাদের জানাইব যে, সেই জামাই তাঁহাদের সকল আশায় ছাই ঢালিয়াছেন, আজ আমাদের খাইবার সংস্থান পর্য্যন্ত নাই। আহা! কি পাপে ঐ হতভাগা সন্তানগুলি আমার গর্ভে জন্মিয়াছিল? তাহাদের যে দুবেলা দুমুঠো ভাতও জোগাইতে পারি না; বাছারা কি অবস্থায় ছিল, আর কি অবস্থায় এখন রহিয়াছে, দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়; একখানা ভাল কাপড় নাই, একখানা ভাল জামা কেহ পরিতে পায় না; ভাল খাওয়া তো দূরে থাকুক, বোধ হয়, দুবেলা পেট ভরিয়াই খাওয়া হয় না। কখনও স্বামীর যদি দেখা পাই, তখনও তো সহজ অবস্থায় পাই না; দৈবাৎ যদি সহজ অবস্থায় দেখিতে পাই, তাহা হইলেই বা কি? তাঁহাকে যে রোগে ধরিয়াছে, তাহাতে তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি তো অনেক দিনই গিয়াছে, সংসারের কথা তুলিলেই হয় রাগিয়া উঠিয়া যান, নচেৎ কাঁদিয়া আবার মদ খাইতে আরম্ভ করেন। বুঝিয়াছি যে, তাঁহাকে বলিয়া আর কোনও উপায় হইবে না, ঘোর বিকারগ্রস্ত রোগীর দ্বারা আর কি উপায় হইবে? তবে কি আমার

অদৃষ্টে ভিক্ষা করাই লেখা আছে? বাপ মার কাছে ভিক্ষা করাও, ভিক্ষা করারই তো সামিল। আর এখন তো আমার একটা পেট নয়; আমার এই এতগুলি কাচ্চা বাচ্চা লইয়া কেমন করিয়া তাঁহার ঘাড়ে গিয়া থাকি? উঃ! তাঁহাদের কত আক্ষেপই না হইবে—যখন শুনিবেন যে আমি এই হাড়ীর হালে আছি, তখন তাঁহাদের প্রাণে কি আগুনই না জ্বলিবে! তারপর, শুধু বাপ মা লইয়াই তো সংসার নয়, আর সকলে আমার এ উৎপাত সহ্য করিবে কেন? তার চেয়ে আমার মরণ হয় না কেন? জীবনের সাধ তো মিটিয়াছে, আর কেন? কিন্তু ঐ হতভাগ্য শিশুগুলির দিকে যখন দেখি, তখন যে আবার বাঁচিতে ইচ্ছা করে; আর মরা হয় না। আমিও যদি যাই তো ইহাদের কে দেখিবে, ইহাদের আর তো কেহ নাই; এই চিন্তা যখন হৃদয়ে আসে তখন আর মরিতে পারিনা। ইহাদিগকে দেখিলেই জগতে আবার সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে, হৃদয়ে জ্যোৎস্না বিকশিত হয়, আমার সব জ্বালা যন্ত্রণা তিরোহিত হয়। ভগবান্ কত সুধা দিয়া ঐ মুখগুলি গড়িয়াছেন যে, এত বিষের মাঝেও তাহাদের মুখ দেখিলে প্রাণে সুধার উৎস খুলিয়া যায়! কেন ভগবান্ জগতে মা'র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যদি সৃষ্টি করিলেন তো মায়ের প্রাণে চিরানন্দ ঢালিয়া দিলেন না কেন; এ যন্ত্রণা কেন আনিলেন? মায়ের প্রাণে ছেলের কষ্ট কি সহ্য হয়? এই সব সোণার চাঁদকে ফেলিয়া যে পিতা অন্য আমোদে লিপ্ত হইতে পারে, যে ইহাদের সুখ স্বচ্ছন্দতার দিকে উদাসীন হইয়া নিজের নেশার জন্য ব্যাকুল হইয়া বেড়ায়, তার প্রাণ কত কঠিন কে জানে? আমি আর কোনও দাবী রাখিনা, আমার গুণ নাই রূপ নাই, তাঁহার মনে আনন্দ দিবার মত কিছুই আমার নাই তা মানিয়া লইলাম, কিন্তু ইহাদের তো দাবী আছে, ইহাদের তো জোর চলে; এদের মুখের

দিকে কি করিয়া তিনি না চাহিয়া থাকিতে পারেন? কি বলিয়া মনের দুঃখ জানাইব জানিনা; কি বলিয়া ভগবানের কাছে নিজের বেদনা জানাইতে হয় তাহা জানিনা। আরও কত দুঃখ অদৃষ্টে আছে তাই বা কে জানে? পূর্ব্ব জন্মে, বোধহয়, আমি কোনও স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলাম, তাই আজ্ আমার এ সব যন্ত্রণা। তা সত্যকথা বলিতে কি, আমি নিজের দুঃখকে দুঃখ বলিয়াই ভাবিনা, কিন্তু ঐ ছেলে কটীর কষ্ট দেখিলে আমি আত্মহারা হই, তখন মনে বড় আক্রোশ আসে, স্বামীর উপরও অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠি। কিন্তু সে রাগ যে বেশীক্ষণ রাখিতে পারিনা, কেমন করিয়া রাখিব? পাগলের উপর কি কেউ রাগিতে পারে? উনি তো পাগল হইয়াছেন, নচেৎ যাঁহার প্রাণে অত ভালবাসা, অত স্নেহ, অত রসিকতা, তিনি ঐ নীচ লোক গুলোর সঙ্গে মাতিয়া বেড়াইতে পারেন? সজ্ঞানে কি কেহ এমন করিতে পারে? কি লজ্জা কি ঘৃণার কথা। মানুষের প্রবৃত্তিকেও ধন্য; চির দিন কি মাথা হেঁট করিবার জন্যই আমার জন্ম হইয়াছিল। সংসারে মুখ দেখান যে ভার হইয়া উঠিয়াছে নিজের জ্বালা নিজের মনের মধ্যেই পুষিয়া রাখিয়া দিনরাত্রি ভাবিতেছি পৃথিবী দ্বিধা হও; আর যেন জগতের সম্মুখে আমার এই কালামুখ দেখাইতে না হয়। আর সেই জ্বালা কার জন্য—কার জন্য আমার এই দুর্দ্দশা, এই লজ্জা? যিনি আমার দেবতা, যিনি আমার সর্ব্বস্ব, যিনি আমার আদর্শ হইবেন, যাঁহার সহিত আমার জীবন মরণের সম্বন্ধ সেই স্বামীর জন্য। কি অপরাধে আমার এই শাস্তি? আমার কি প্রাণ নাই—আমার কি মনে অভিমান নাই? শেষে কি আমায় পরের গলগ্রহ হইতে হইবে—আমার ছেলেদের অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইবে! এ চিন্তাতেও বিষ আছে। ঐ দুশ্চিন্তা যখন মনে আসে, তখন

আমি আর আমাতে থাকি না। আমার প্রাণপণে ভালবাসার এই ফল? আমি আমার বলিয়া তো কিছুই রাখি নাই, তাই কি আজ আমার এই পরিণাম? ভগবান্ হৃদয়ে বল দাও—সুখ তো আর আমার হইবে না, এই দারুণ যন্ত্রণা সহিবার মত বল দাও; আর তোমার কাছে লইয়া চল; জগতে আমার সাধ আহ্লাদ করা বুঝি ফুরাইয়াছে—আমি যেন তোমার পায়ে মন রাখিতে পারি। আর কত ছলনা করিবে নারায়ণ? আমার আজীবনের সংস্কার—তুমিই আমার পতিরূপে বর্ত্তমান, সে সংস্কার রাখিয়া যেন মরিতে পারি; তিনি যাই হউন, যেন তাঁরি পায়ে মতি থাকে, যেন সে ধারণা, সেই চিন্তা আমার মন হইতে কখনও না পলাইতে পারে—তাই কর প্রভু; তাঁর শত সহস্র দোষ থাকিলেও যেন কখনও না ভুলি যে, উনিই আমার ইহকাল পরকালের গতি, উনিই আমার ধর্ম্ম, উনিই আমার—জাগ্রত দেবতা। হৃদয় বড় দুর্ব্বল হইয়াছে—বল দাও প্রভু, বল দাও, যেন আমার উচ্চ মস্তক নীচু না হয়, জগতে যেন আমার এ সান্ত্বনা থাকে যে, আমি নিজের পথ ভুলি নাই—শত কষ্টেও শত নির্যাতনেও স্ত্রীর কর্ত্তব্য ভুলি নাই। মাঝে মাঝে চক্ষের সম্মুখে বিভীষিকা দেখি—সে সময় আমার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না, নারায়ণ আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর। আমার স্বামীকে সুমতি দাও, আমার দুধের বাছাদের দুঃখ দূর কর। তা যদি না কর—অত সুখ পাপিনীর সহিবে কেন?—তাহা হইলে আমায় এমন স্থৈর্য্য দাও যাতে আমি সকল দুঃখ হাসি মুখে সহিতে পারি, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবেই ভাবিয়া সকল যাতনা মুখ বুজিয়া সহিতে পারি।

———

১১

অক্ষয় বাবুর কথা।

সতীশের অবস্থা দিন দিন হীন হইতে লাগিল, দেখিয়া শুনিয়া বড়ই কষ্ট পাইলাম। আহা লোকটা কি মাটি হইয়াই গেল—অমন মাথা, অমন বক্তৃতা-শক্তি, অমন হাস্য-শুভ্র রসিকতা, সব নষ্ট হইয়া গেল; আমরাও তো মদ খাই, কিন্তু মদখোর অমন অধঃপাতে যাওয়ার দৃষ্টান্ত, ছোটলোকের মধ্যেও বিরল। তাহার স্ত্রী পুত্রের দুর্দ্দশা দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়। কেন জানি না, সতীশ আসা অবধিই তাহার প্রতি আমার মন পড়িয়াছে, তাহাকে ভাইয়ের মত দেখিয়াছি, তাই তার পতনে, তার পরিবার বর্গের দুঃখে আমার মন বিচলিত হইয়া উঠে। সতীশ এখন প্রায়ই যে কোথায় চলিয়া যায়, তাহার কোনও উদ্দেশই পাওয়া যায় না। যখন বাড়ীতে থাকে, তখনও সজ্ঞান অবস্থায় প্রায়ই তাহাকে পাওয়া যায় না, কোর্টে আসিলেও সেই অবস্থাতেই থাকে, কি বলে, কি করে তাহার ঠিকানা নাই, কাজেই সাহস করিয়া কাজ কর্ম্ম বড় একটা কেহ দিতে পারে না। কয় দিন হইতে সতীশ নিরুদ্দেশ হইয়াছে।

একদিন দ্বিপ্রহরে বাটীতে বসিয়া আছি, এমন সময় সতীশের পুরাতন ভৃত্য অভয় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "ব্যাপার কি অভয়? অমন করিতেছ কেন?" সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বাবু আপনি আমার বৌমা আর ছেলে গুলোর একটা উপায় করুন, তারা তো আর

বাঁচে না, বাবুর অত্যাচারে তারা মারা যাবে—বাবু সকলকে খুন ক'র্‌বে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হইয়াছে—আজ্ কি কিছু অত্যাচার করিয়াছে নাকি?" অভয় বলিল "বাবু কি আর ব'ল্‌বো, ব'ল্‌তে বুক ফেটে যাবে, বাবু আজ আমার বৌমার যে লাঞ্ছনা ক'রেছে তা ব'ল্‌তে আমি যে ছোটলোক আমারও যেন মাথা কাটা যাবে—উঃ! আমার বুড়ো বয়সে এই কষ্ট ছিল, এও আমাকে দেখ্‌তে হ'ল। এর আগে আমি ম'লেম না কেন?" বলিয়া সে আবার কাঁদিতে লাগিল। আমি—কি লাঞ্ছনা ক'রেছে খুলেই বল না, সব শুনে একটা বিহিত করা যাবে।

অভয়—বাবু আপনি তো জানেন বাবু আমার কদিন ধ'রে কোথায় গেলেন তার পাত্তা পাওয়া গেল না। হঠাৎ আজ্ সকাল বেলা টল্‌তে টল্‌তে বাড়ী এলেন। এসেই বউমাকে গিয়া ব'ল্লেন "টাকা বার কর; আজ্ আমার মদ খাবার পয়সা নেই, মদ খাওয়া হয় নি, ওরা আমায় মদ দিলে না, তাড়িয়ে দিলে, পয়সা দাও।" বউমা কত কাতর হ'য়ে ব'ল্লেন "ওগো এখনও একটু সাম্‌লাও, আমরা যে হাড়ীর হালে আছি, একবার চেয়ে দেখ, ছেলে গুলোর পানে একবার চাও, ওরা যে খেতে পাচ্ছে না তা একবার ভাব।" চোরা না শুনে ধম্মের কাহিনী, বাবুর গর্জ্জন শুনে পেটে হাত পা সেঁদিয়ে যেতে লাগ্‌ল—"সে সব হবে এখন, এখন পয়সা দাও, সমস্ত দিন মদ খাওয়া হয় নি, গা জ্বলে গেল, গলা শুকিয়ে গেল, দাও মদ দাও, না হ'লে আমার প্রাণ থাক্‌বে না, মদ দাও, প্রাণ ঠাণ্ডা হ'ক্, তার পর আর যা কর্‌বার তা ক'র্‌বো, তোমাদের জন্যে পয়সা রোজগার ক'র্‌তে ছুটবো এখন, এখন পয়সা দাও।" বউমা কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। ব'ল্লেন "হা হরি! পয়সা কোথায় পাব? ঘরে যে আর কিছু নেই, গায়ে যে দুখানা ছিল তা তো গেছেই, তোমার লজ্জা

করে না, এই ছেলে গুলো কা'ল্ কি খাবে তার সংস্থান নেই, তুমি মদ খাবার পয়সা চাইতে এসেছ আমার কাছে? ছি ছি ছি, তুমি না বামুনের ছেলে, লেখা পড়া শিখেছ? এই সব ছেলে গুলোর দিকে একবার তাকাও—আর তা না কর তো তাদের এনে দিচ্ছি, তাদের গলায় পা দিয়ে মার, আমার গলায় পা দাও, সব জুড়োক।" বাবু মশায়, একথা গুলো শুনে আমারও চ'খে জল এল, কিন্তু আমার বাবুর মন একটুও নরম হ'ল না, বরং তাঁর মেজাজ আরও গরম হ'তে লাগ্‌ল। তাঁর মুখে এক কথা "পয়সা দাও—আজ মদ খাইনি—পয়সা দাও, ও সব বক্তৃমে রাখ; প্রাণ যায়, মদ দাও, মদ দাও।" এইবার বউমার রাগ হ'ল; তিনি ব'ল্লেন "কোথা পাব পয়সা—পয়সা নেই, যাও বিরক্ত ক'রো না।" আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম, মনিবের কথায় চট্‌ ক'রে ঘেঁস্‌তে চাইনি। কিন্তু বাবুর মেজাজ দেখে আমি আর বাইরে থাক্‌তে পার্‌লেম না, ভিতর দিকে ছুটে এলুম। এসে যা দেখ্‌লুম—হা ভগবান! এর আগেই আমার মরণ হ'ল না কেন? এসে দেখ্‌লাম বাবু পাগলের মত মাকে আমার মাচ্চেন—আর মা আমার নীরবে তাই সহ্য ক'র্‌চেন। আমি তো ছোটলোক, আমারও বুক যেন হিম হ'য়ে গেল, কিন্তু তার পরেই সমস্ত রক্ত মাথায় ছুটে গেল, আমি চাকর মনিবের সম্পর্ক ভুলে গেলুম, বাঘের মত লাফিয়ে প'ড়ে বাবুকে ধ'রে, হিড় হিড় ক'রে টেনে নিলুম। তিনি তো ব'ক্‌তে ব'ক্‌তে, চেঁচাতে চেঁচাতে, বাড়ী থেকে হন হন ক'রে বেরিয়ে চ'লে গেলেন। আমি গিয়ে মাকে তুল্‌লুম, আহা তাঁর সে সময়কার মূর্ত্তি দেখে পাষাণও ফেটে যায়—গো পাষাণও ফেটে যায়। মাকে বুঝি আর রাখ্‌তে পারি না, এ অপমান স'য়ে কি সে ভদ্রলোকের মেয়ে আর বাঁচ্‌বে। "বাবা কেন আমায় ছাড়ালে, মেরে ফেল্‌তো তো ভালই হ'তো, এ নিত্য যন্ত্রণা

স'য়ে, আর বেঁচে থেকে চলে কি বাবা?" তাঁর মুখের বুলি হ'ল এই। ছেলে মেয়ে গুলো কেঁদে অস্থির হ'চ্চে, আমি কোনও রকমে তাদের সাম্‌নে ধ'রে দিয়ে হুজুরকে খবর দিতে এসেছি—এর একটা উপায় করুন, তা না হ'লে তো সবাই মারা গেল।" অভয়ের বৃত্তান্ত শুনে আমার মাথায় যেন আগুণ জলিয়া গেল, "অঁ্যা সতীশটা এত অধঃপাতে গেছে, একেবারে ছোটলোক হ'য়ে গেছে, যা' হক্ আমি বিধান ক'চ্ছি" বলিয়া তখনই ভিতরে গেলাম, এবং স্ত্রীকে গিয়া বলিলাম যে, এখনই গিয়া সতীশের স্ত্রী ও ছেলেদের লইয়া না আসিলেই নয়। তিনি তো সতীশের স্ত্রীকে ভগ্নীর অধিক স্নেহ করিতেন, ও কথা শুনিয়াই তখনই সতীশের বাসায় চলিয়া গেলেন।

অনেক সাধ্য সাধনায় আমার স্ত্রী উহাদের আমাদের ওখানে লইয়া আসিলেন। স্ত্রীর মুখে শুনিলাম যে, সতীশের স্ত্রী কিছুতেই আসিতে চাহেন নাই—কেবলই বলিয়াছিলেন "দিদি আর কেন আমায় ধ'রে রাখ্‌তে চাও, আমার অদৃষ্টে যা হবার তাতো হ'য়েছে, আরও যা হবার তা হ'ক্, বাকী থাকে কেন? ছেলে গুণোর পানে চে'য়ো, আমাকে এইখানেই ম'র্‌তে দাও, এইখানেই স্বামীর সোহাগ পেয়েছিলেম, এই খানেই তাঁরই হাতে আমায় ম'র্‌তে দাও। আমি একটা ক্ষুদ্র মেয়ে মানুষ বই তো নই, আমায় সব সইতে হয়, আমার প্রাণ আছে না মান আছে? বাপ মা যাঁর হাতে স'পে দিয়েছেন তাঁরই কাছ থেকে মরণ চেয়ে নেওয়াই ভাল নয় কি? আর কি সুখের আশায় বেঁচে থাকৃতে হ'বে?" তাঁর ক্রন্দনের বিরাম নাই, অশ্রুজলে বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতেছে; তাঁর মুখের কেবল একমাত্র কথা "আমায় বিষ এনে দাও—আর আমি বাঁচ্‌তে চাই না, যাঁর যত্নের উপর আমার দাবী, তাঁর কাছে এই অপমান স'য়ে আমি আর বাঁচিতে চাই না, তোমাদের

উপর আমার কি দাবী দিদি? বাপ মায়ের উপরই বা আমার কি দাবী আছে যে, তাঁদের কাছে আদর খাবার জন্য যাব?" যাহা হউক, সন্তান গুলির মুখপানে চাহিয়া তিনি কোনও রকমে দিনপাত করিতে লাগিলেন। হায় হায় সতীশটা কি? মানুষ না পশুরও অধম? অমন লক্ষ্মীর গায়ে হাত তোলে? মদে যে মানুষকে এমন অমানুষ করিয়া ফেলে আগে তাহা বুঝি নাই। আমিও তো মদ্যপান করি, কৈ আমার তো অমন কুপ্রবৃত্তি কখনও হয় না? ভগবানের রাজ্যে কত অদ্ভুত জানোয়ারই আছে! দুনিয়া রূপ চিড়িয়া খানা দেখিতে দেখিতে হাড় কালী হইয়া গেল।

আর তো চুপ করিয়া থাকা যায় না, আমি সমস্ত বৃত্তান্ত সতীশের শ্বশুরের কাছে লিখিয়া পাঠাইলাম, আর লিখিয়া দিলাম যে, একটা বিহিত করা অচিরেই প্রয়োজন। না জানি, ঐ পত্র পাইয়া ভদ্রলোকের মনে কত জ্বালাই উপস্থিত হইবে। তা কি করি—না লিখিলেও তো নয়, কারণ সতীশের আশা তো ছাড়িয়াই দিতে হইবে। যে বিষম রোগে উহাকে ধরিয়াছে, সে রোগের যে আর কখনও উপশম হইবে সে আশা দুরাশা মাত্র। হরি! হরি! কোন্ পাপে ঐ সুশীলা সতী লক্ষ্মীর এ দুর্দ্দশা—এ অপমান—আর সে অপমান তাহারই হাতে যাহার উচিত তাহাকে মাথার মনির মতন আদরে রাখা। ছি ছি! আমরা পুরুষ জাতি বড়ই হীন হইয়া পড়িতেছি। আমাদের জগৎকে দেখাইবার যা কিছু আছে, তা ঐ অন্নপূর্ণা রূপিনী হিন্দু স্ত্রী—সেই স্ত্রীর প্রতি যদি এ অত্যাচার হয়, তাহা হইলে যে ভারত ভূমি শ্মশান হইবে। কে জানে মা জগদম্বার এ কি ছলনা! সতীশের স্ত্রীর কথা গুলা যেন মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত করে। না; সতীশের আর মঙ্গল নাই, নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ডাকিয়া আনিয়াছে—আর তাহাকে রক্ষা করে কে?

সে নিজের হাতে নিজের হৃৎপিণ্ড ছেদন করিয়াছে—আর তাহার এ জগতে স্থান নাই ; তাহার নিজ কার্য্যে তাহার উস্কা পিণ্ডরূপ জীবনটা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে ; কি করিব ? বড় যত্নে বড় আদরে তাহাকে ভ্রাতৃভাবে বুকে তুলিয়া লইয়াছিলাম, সে কিনা তাহার এই প্রতিদান দিল—আমার মাথা হেঁট করিল ? ভদ্রলোক নামে কলঙ্ক লেপিল, সাজান সংসারে আগুণ ধরাইয়া দিল, আমি কি করিব ? আমি আর কত দিন সে কথা গোপন করিয়া রাখিব ? কাজেই আমাকে সব কথা জানাইতে হইল।

সাধের কন্যার এ হেন অবস্থার কথা শুনিয়া কোন্ ভদ্রলোকে স্থির থাকিতে পারে ? সতীশের শ্বশুর ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহার মনে যে জামাতার প্রতি দারুণ ঘৃণা ও বিরক্তির সঞ্চার হইয়াছিল—তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। না হইবেই বা কেন ? সন্তানের কষ্ট কে সহ্য করিতে পারে ? যখন পিতা আর কন্যার প্রথম দর্শন হইল, তখনকার দৃশ্য মর্ম্মভেদী, সে কথা আর বলিয়া কি হইবে। ফলে তিনি তাঁহার কন্যা ও সন্তানগণকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। আমরাও দেখিলাম যে, সেই ব্যবস্থাই সুব্যবস্থা, নচেৎ ইহারা হয়তো অন্নাভাবে মারা যাইবে, অথবা আরও কত অত্যাচার সহ্য করিবে। কিন্তু আমার স্ত্রীর মুখে শুনিয়াছি যে, সতীশের স্ত্রী যদিও মমতা বশতঃ ঐ ব্যবস্থায় সম্মত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার মনে বিশেষ একটা হর্ষের উদয় হয় নাই। তখনও তিনি স্বামীর কথা ভাবিতেছিলেন, এবং যাইবার সময় তাঁহার হাতে ধরিয়া বলিয়া গিয়াছেন—যে যেন আমরা ঐ হতভাগ্যের সংবাদ লই, বড় জ্বালায় তিনি তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন, কিন্তু আমরা যেন তাহার প্রতি বিরূপ না হই, মাঝে মাঝে তাহার তত্ত্বাবধান করি ! ধন্য নারী তোমার মহিমা, ধন্য তোমার

প্রেম, ধন্য তোমার আত্মবিলোপ সাধনের প্রবৃত্তি, ধন্য তোমার ভালবাসা! তোমরাই জগৎকে স্বর্গ করিয়া রাখিয়াছ—সেই মহিমা বুঝিতে না পারিয়া যে তোমাদের মনে কষ্ট দেয় সে হতভাগ্য বৈ আর কি! সতীশের স্ত্রীর শেষ কথা, "দিদি আমি চল্লুম—তোমরা দেবতা, তোমাদের ইহজন্মে কখনও ভুলতে পারব না, হয় তো আর কখনও দেখা হবে না, অভাগিনীকে মনে রেখো, আর আমার স্বামীকে দেখো, যদি এই ছেলেগুলো এই পেটের কাঁটাগুলো না থাকতো, তা হ'লে আমি যেতেম না, কিন্তু এদের দুঃখ যে দেখতে পারি না। দিদি! সে যে পাগল হ'য়েছে, তাকে তোমরা দেখো, আমার কাজ তোমাদের দিয়ে গেলুম, তোমরা দেখো, তোমরা পারবে, আমি পাপীয়সী—আমি তাই অমন স্বামী হারালুম, আমার অদৃষ্টের দোষে। হয়তো আমি তাঁকে তেমন ভালবাসতে পারিনি, তাঁর মন ওঠেনি, সবই আমারই কর্ম্মের ফল, আমায় মাঝে মাঝে তাঁর খবর দিও, বাবা যে রেগে আছেন, তাতে তো তিনি আর তাঁর খবরও নেবেন না, তোমরা খবর না দিলে আমি ম'রে যাব।" তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় লইলেন, সে দৃশ্য বড় করুণ। আমার হৃদয়ে সে দৃশ্য যেন আগুনের অক্ষরে লিখিত আছে, তাহা মুছিবার নয়। এই সংসার, এরই জন্য আমরা সকলে আসল ছাড়িয়া লালায়িত হইয়া ফিরি। মায়াময়ীর মায়া—"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া"।

ভাগ্যে তাহারা চলিয়া গিয়াছিল, তাহা না হইলে একটা বিষম বিভ্রাট বাধিত। তাহারা যে দিন চলিয়া গেল, সেই দিনই ক্ষণেক পরে সতীশ টলিতে টলিতে আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত। "দাদা এরা সব নাকি চ'লে গেল? চ'লে গেল? অ্যাঁ, আমি যে তাদের দেখবার জন্যে আসছি, তার পায়ে ধ'রে মাপ চাইতে আসছি, সে চ'লে গেল—দাদা তুমি দের তা ছেড়ে দিলে কেন? কে নিয়ে গেল—কে আমার সংসার

আঁধার ক'রে দিলে।" সে তাহার খেয়ালে কত কি বলিয়া, কখনও ক্রোধে ফুলিতে লাগিল, কখনও কাঁদিতে লাগিল, স্ত্রীর নাম করিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল, কখনও কত কথা বলিয়া হাসিতে লাগিল। আমি তাহাকে কতরকম সান্ত্বনা করিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহার সেই এক বুলি—"কেন গেল, কেন যেতে দিলে, আমি কি ম'রে গেছি? তবে কেন গেল?"

সে বলিতে লাগিল "দাদা আমি সব বুঝেছি—আমি নীচ কাপুরুষ ছোট লোক আর আমার সংসারে থাকা ভাল নয়, আমায় মদ দাও, আমি এইবার নিস্পরোয়া হ'য়ে মদ খাই—যেন শীঘ্র ম'র্ত্তে পারি তাই আশীর্ব্বাদ কর, অমন সোণার সংসার যে ছারখার দিয়েছে তার আর বেঁচে ফল কি? যে অমন সোণার প্রতিমার গায়ে হাত তুলেছে সে আর ভদ্রসমাজে মুখ দেখাবার যোগ্য নয়, ঠিক্ কথা। দাও আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমি ভাল ক'রে উচ্ছন্ন যাই। কিন্তু সে আমাকে ছেড়ে গেল, মাতালের উপর তার দয়া হল না, তবে আর কেন?"

আমি বলিলাম, "ছি সতীশ, তুমি নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ক'রেছ, এখন আর আপশোস ক'র্‌লে কি হবে? একটুওতো ভাব্‌লে না, একটুওতো চিন্তা করিলে না যে কোন পথে চলেছ, এতে কি ফল হবে। তোমার ব্যবহারে কোন্ ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে মিশ্‌তে চায়। তা যাই হ'ক এখনও বুঝে সুঝে চল, এখনও তোমার সব ফিরিবে। আর যাই কর সেই ভদ্রলোকের মেয়ের উপর রাগ ক'রো না, তুমি নিতান্ত মূর্খ, বলিতে কি, তুমি নিতান্ত বর্ব্বর তাই অমন প্রতিমা নিজের হাতে ভাঙিবার চেষ্টা করিয়াছ, কিন্তু সে এততেও তোমারই জন্য ব্যাকুল,—তোমার চিন্তাতেই এখনও তাহার দিন কাটিছে, যাবার সময় সে কেঁদে

গেছে, পার যদি তো তাহার জীবনে আবার হাসি আনিবার চেষ্টা কর, আর তা যদি না কর তো সোজাকথা বলি—তোমার মরাই ভাল।”

“উঃ কি হ'লো কি হ'লো, আমার সাধের ফুলবাগানে নিজে আগুন ধরাইয়া দিলুম, সব পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল,” বলিতে বলিতে সে উঠিয়া বেগে প্রস্থান করিল, কোথায় গেল তাহা জানিতে পারিলাম না।

এইরূপে সতীশের সংসার জন্মের মত ভাঙ্গিয়া গেল।



অক্ষয়বাবুর কথা।

সেই যে সতীশ আমার গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল, তার পর কয়েকদিন আর তার কোনও সংবাদ পাই নাই। যথার্থ কথা বলিতে হয় যে, সেদিন বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, তাহার মনে একটা অনুশোচনা উপস্থিত হইয়াছে—কিন্তু তখনও সে নেশার সম্পূর্ণ অধীন, এই জন্য বুঝিয়াও তাহার বুঝা হইল না, জীবনের গতি ফিরাইবার শক্তি আর তাহার ছিল না। তাহার রহিল কেবল গভীর আর্ত্তনাদ আর নেশা। তাহার জীবনটা ঠিক যেন একটা জলপ্রপাত—কল কল ছল ছল করিতে করিতে বহিয়া যাইতেছে, হঠাৎ যেন আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়াই বহুনিম্নভূমে আছড়াইয়া পড়িতেছে, আর উঠিবার বা ফিরিবার সামর্থ্য নাই, কেবল মর্ম্মান্তিক ক্রন্দন ভিন্ন আর কোনও উপায় থাকে না। সতীশের জীবনেও ঠিক ঐরূপ ঘটনা ঘটিল, সে শোধরাইবার বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল, চেষ্টা করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত আর তাহার ছিল না। কিন্তু মাঝে মাঝে তাহার অনুশোচনা আসিত, তাহা সেইদিন বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম—নিষ্ফল অনুশোচনায় তাহার জীবন ভরিয়া যাইতেছিল, তাহা স্পষ্ট জানিয়াছিলাম।

ইহার পর সতীশ ঘন ঘন আদালতে আসিতে লাগিল,—বুঝিলাম বেচারা আবার নষ্টভাগ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সহজ অবস্থায় কখনও তাহাকে পাইলাম না। কথার মধ্যে তাহার একই—তাহার সব ফুরাইয়াছে, আর কি সে সব ফিরিবে? আহা! সতীশের জীবন কথা

চিন্তা করিলে বড় দুঃখ হইত, তাহার জন্য যথার্থ কষ্ট হইত। এ যেন একটা পল্লবাদি সমন্বিত বটবৃক্ষ হঠাৎ বজ্রাঘাতে শুকাইয়া গিয়াছে, আর তাহাতে কখনও রসের সঞ্চার হইবার আশা নাই, অর্দ্ধপথে তাহার তরুজীবন শেষ হইয়া গিয়াছে, উহার কাছ হইতে আর ফল ফুল বা ছায়া পাইবার কোনও আশা নাই, কে জানে কেন তাহার প্রতি আমার সহানুভূতি হইত, উহার অত অপকীর্ত্তি সত্বেও তাহার এই অবস্থাতে আমি যেন ব্যথিত হইতাম। আমিও মদ খাইতাম বলিয়া কি? হয় তো তাই।

আসল কথা এই যে, এস্থানে সে আসা অবধি আমি তাহার অভিভাবক স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছিলাম, সহজ অবস্থায় সেও আমাকে ভালবাসিত, সম্মান করিত, আমিও তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিতাম না; এখন তাহার দুর্দ্দশায় কাজেই স্বভাবতঃ আমার মনে একটা অব্যক্ত বিষাদের ছায়া পড়িয়াছিল। প্রথম যখন সে আমাদের মধ্যে আসে, তখন তাহাকে আমি একটা অটল পর্ব্বতের চূড়ার মত ভাবিতাম; তাহার সুতীক্ষ্ণ মেধা, প্রখর স্মৃতিশক্তি, অক্লান্ত বাক্‌পটুতা, আর তাহার বহুবিষয়িণী শিক্ষা দেখিয়া তাহাকে আমি আমাদের ভবিষ্যৎ নেতাস্বরূপ বরণ করিয়া লইয়াছিলাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, ইহার উপর যখন তাহার নিরাবিল রসিকতা পর্ব্বতবক্ষঃ-নিঃসৃত নির্ঝরিণীর মত সকলকে তৃপ্ত করিত, তখন আমার মনে যে কি আনন্দ হইত তাহা আর কি বলিব? সেই সতীশ আজ্ অমন হীন হইয়া গেল, ইহাতে আমার মনে কষ্ট হইবে না তো কি? ইহার ভিতর কতটুকু আত্মাভিমান ছিল তাহা বলিতে পারি না, আমার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি যে সে একেবারে খেলো করিয়া দিল সে ভাবটাও হয়তো ছিল। কিন্তু একটা সামান্য শুকপক্ষী পুষিয়া তাহার অভাবেও লোকের মনে যখন কষ্ট হয়,

তখন সতীশের অধঃপতনে আমার কষ্ট হওয়া কি স্বাভাবিক নয়? তাহাকে যে আমিই হাতে ধরিয়া মানুষ করিতেছিলাম। বিশ্ব-রঙ্গালয়ে সতীশের অভিনয় শেষ হইয়া গিয়াছে—এখন আর সে সেখানে shut and fut করিবে না; এখন তাহার জীবনে যবনিকা পড়াটুকু বাকি আছে, তাহাকে দেখিলেই এই চিন্তা আমার হৃদয়ে অনিবার্য্য ভাবে জাগিয়া উঠিত। বুঝিলেও সে কথা বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহার মাতাল প্রাণেও চিন্তার রেখা স্পষ্ট ফুটিতেছিল, এখন তাহাকে দেখিলেই সে কথাও আমার মনে হইত। তাহার হৃদয়ে চিন্তাকীটের প্রাণান্তক দংশন আরম্ভ হইয়াছে, আর তাহার হাসি নাই, মেধা নাই, বাক্‌চাতুরী নাই। যখনই তাহাকে দেখিতে পাই, তখনই তাহাকে বড় গম্ভীর বড় চিন্তাক্লিষ্ট বড়ই নিরুৎসাহ দেখি। বুঝিতে পারি—তাহার ভিতর একটা ভীষণ আন্দোলন চলিতেছে, দারুণ বন্ধনের হস্ত হইতে বাঁচিবার জন্য সে তাহার নিস্তেজ শক্তি লইয়া একটা প্রবল চেষ্টা করিতেছে, অথচ তাহার সকল প্রযত্ন বিফল হইতেছে, তাহা সে যেন প্রতিমুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিয়া আরও নির্বীর্য্য হইয়া পড়িতেছে। আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছিলাম, যে এই দ্বন্দ্বের ফলে এইবার তাহার অন্তরের মত দেহও ভাঙ্গিয়া পড়িবে, এই দ্বন্দ্বে তাহার পরাজয়ও যেমন অবশ্যম্ভাবী, তাহার সকল প্রযত্নের জন্মের মত নিঃশেষ হওয়াও তেমনি অবশ্যম্ভাবী। এখন যখনি তাহাকে দেখি তখনই ঐ চিন্তাই আমাকে অবসন্ন করে। আমার উপর তাহার স্ত্রী যে ভার দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আমি এতাবৎ পূরণ করিয়া আসিতেছিলাম, তাঁহাকে রীতিমত সংবাদ দিয়া আসিতেছিলাম; সে সংবাদ যে সর্ব্বতোভাবে তৃপ্তিকর হইতেছিল না, আশাপ্রদও হইতেছিল না, কি করিব? নিতান্ত মিথ্যা কথা তো বলিতে পারি না।

দিন কতক পরে আমার আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইল। শুনিলাম একদিন আদালত হইতে ফিরিয়া গিয়া সে দলে মিশিয়া অতিরিক্ত মাত্রায় মদ্যপান আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার পরেই তাহার শরীরে অনবরত কম্প দেখা দেয় ও কম্পের সহিত জ্বর আসে। সেই অবস্থায় তাহাকে তাহারা বাটী লইয়া আসে, তাহার বাসা তখনও ছিল; সেইখানে আনিয়া একজন আসিয়া আমাকে সংবাদ দেয়। গিয়া দেখি যে, তাহার শরীরে তখনও ঘন ঘন কম্প উঠিতেছে, জ্বর বেশ রহিয়াছে, এবং বিকারের অবস্থা আসিয়াছে, প্রলাপ বকিতেছে এবং যেন সর্ব্বদাই একটা কিছু বিভীষিকা দেখিতেছে এমনি ভাবে চীৎকার করিতেছে। ডাক্তার ডাকিয়া আনিলাম। তিনি আসিয়া সমস্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, নাড়ী ক্ষীণ, জিহ্বা অত্যন্ত মলযুক্ত, জ্বর বেশ; সমস্ত লক্ষণ পরীক্ষান্তে তিনি বলিলেন যে ইহা মাদকতার বিকার (Delirium Tremens) ভিন্ন আর কিছুই নহে। রীতিমত মদ্যপায়ীর মনে যদি সহসা কোনও একটা আঘাত লাগে ও সেই আঘাতের প্রতীকার করিবার জন্য যদি সে পুনরায় অতিরিক্ত মদ্যপান করে, তাহা হইলে এই রোগের উৎপত্তি হয়। বড়ই চিন্তায় পড়িলাম, কেই বা দেখে শুনে, কেই বা সেবা শুশ্রূষা করে। সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া দেখিয়া এবং ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া তাহাকে কলিকাতায় রাখিয়া আসাই স্থির করিতে বাধ্য হইলাম। নচেৎ, সে নিশ্চয়ই বিনা শুশ্রূষায় ও বিনা বিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য লাভে মারা যাইত। পূর্ব্বেই টেলিগ্রাম দ্বারা সংবাদ দিয়া ও লোকজনের ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে কলিকাতা পাঠাইয়া দিলাম।

সতীশের জীবনে habitual Drunkard (অভ্যাসসিদ্ধ মাতাল) হওয়ার দ্বিতীয় কুফল ফলিল। এতদিন তাহার শরীর সবল ও সুস্থ ছিল, এখন সেই স্বাস্থ্যও নষ্ট হইয়া গেল।

অবশেষে সংবাদ পাইলাম যে সতীশ আরোগ্যের পথে আসিয়াছে, আর প্রাণের কোনও আশঙ্কা নাই। মনে অনেকটা ভরসা হইল যে, এই রোগের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া সতীশ হয়তো শোধরাইবে। কিন্তু সে আশা ফলবতী হইল না। যাহা হউক, তাহার অত্যাচার-নিপীড়িতা পত্নীর অক্লান্ত সেবা ও যত্নে সে যাত্রা সে রক্ষা পাইল। এই সময় সতীশের পত্নী আমার পত্নীকে একটী পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা আমি যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছি। পত্রটীতে সতীশের রোগের বর্ণনার সহিত নিজের কথা অনেক ছিল—সে সব কথা এখন আমাদের বিকৃত বুদ্ধিতে ভাল বোঝা যায় কিনা জানিনা। পত্রটী এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। পত্র ছোট, কিন্তু প্রত্যেক ছত্রে আমাদের শিখিবার কিছু আছে।

————

সুহাসিনীর পত্র

শ্রীচরণেষু

দিদি—

তোমাদের আশীর্ব্বাদে ও ভগবানের কৃপায় উনি এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছেন, কিন্তু কি শরীর কি হইয়া গিয়াছে, দেখিলে চিনিবার জো নাই। উঃ, এ কটা দিন যে কি ভাবে কাটিয়াছে, তা আমিই জানি। নিত্য আশঙ্কা কখন কি হয়। আর সে কি ভীষণ যন্ত্রণা! তাঁর যেন দিবারাত্র নয়নের সম্মুখে কোনও একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিতেছেন, যেন কে তাঁহাকে মারিতে আসিতেছে। ভয়ে সর্ব্বদা আড়ষ্ট এবং বিছানা ছাড়িয়া পলাইবার চেষ্টা; তিন চার জনে ধ'রে রাখা যায় না। প্রলাপের অন্ত নাই—মাঝে মাঝে প্রাণপণ চীৎকার, আবার মাঝে মাঝে যেন কোনও একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় বাক্য রোধ হইতেছে, কখনও কখনও একটা আধটা কথা আমি বুঝিতে পারিতাম। প্রলাপের মধ্যে তিনি যখন বলিতেন—"কি হ'ল, কি ক'ল্লুম—উহুহু সে চ'লে গেল" আমি বুঝিতে পারিতাম যে আমিই এ রোগের মূল। আমার প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের জন্য অনুশোচনা ও আমার চলিয়া আসা এই দুই কারণে তাঁহার মনে সহসা যে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার তখনকার অবস্থায় এই ব্যাধির সূচনা করিয়া দিয়াছিল, এ কথা ডাক্তারেরাও বলিতেছেন। যদি ভাল মন্দ হ'তো, তা হ'লে আমার নরকেও যে স্থান হ'ত না।

তাঁর শিয়রের কাছে ব'সে ব'সে কত ভাবনাই না ভাবিয়াছি, প্রাণের ভিতর কত উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কাই না জাগিত। আর মনে হইত কি জান দিদি? কেন এমন হইল—কি মানুষ কি হইয়া গেল? যাঁর যত্নে

আদর্শ রসিকতায় কবিত্বে আমার প্রাণ ভরিয়া যাইত, আনন্দ ধরিত না, সেই মানুষ এমন হইলেন কেন? সে কি কেবল তাঁহারই দোষ, না আমারও কোনও দোষ ছিল? এক সময়ে হয়তো এ কথা মনেই করিতে পারিতাম না, যখন আত্মাভিমান প্রবল ছিল, তখন ভাবিতেই পারিতাম না যে, আমার আবার দোষ কি হইতে পারে—বাহ্য দৃষ্টিতে দোষ ছিলও না; কিন্তু এখন প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহাকে হারাইবার আশঙ্কা মনে করিয়া নিজের মনের ভিতর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতেছিলাম। দেখিতেছিলাম—আমি সত্যসত্যই তো তখন আত্মাভিমানেই ভরিয়া গিয়াছিলাম, আত্ম-মর্য্যাদার গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিয়াছিলাম। কীর্ত্তনের পদে শুনিয়াছ তো রাধিকার মনে গর্ব্ব হইয়াছিল, তিনি ভাবিতেন—

আমার চরণ স্মরণ করিয়া
পীতবাস প'রে শ্যাম
প্রাণের অধিক করের মুরলী
লইতে আমারি নাম।

আমারও মনে সেই ভাব আসিয়াছিল, আমি তো তখন মনে করিতে পারিতাম না যে—

বঁধু তোমারি গরবে গরবিনী আমি
রূপসী তোমারি রূপে
হেন মনে লয় চরণ যুগল
সদা ধ'রে রাখি বুকে।

আমি মনে মনে ভাবিতাম যে, আমি বুঝি তাঁহাকে বড় ভালবাসি, কিন্তু সত্যই কি তাই? আমার মনে কি অনেকটা দেওয়া নেওয়ার ভালবাসা ছিল না, আমি যে ভালবাসিতাম তাহা কি যথার্থই হিন্দু স্ত্রীর

ভালবাসা, আত্মহীন ভালবাসা, আমার বলিয়া কি কিছুই রাখি নাই'? তখন তাহাই মনে হইত, কিন্তু এখন ভাবিতেছি তা তো নয়'; আমার নিজের প্রতি ভালবাসা সে ভালবাসার সঙ্গে বিলক্ষণ মেশান ছিল। এখন দিবানিশি ভাবিতেছি যে, আমি কি সেই হিন্দু স্ত্রী যাঁহাদের কথা আমরা পুরাণে ইতিহাসে পড়ি—যাঁহারা হাসিতে হাসিতে স্বামীর জন্য সর্ব্বস্ব, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত, বর্জ্জন করিতে পারিতেন; যাঁহারা সকল অবস্থাতেই স্বামীর প্রতি সমান ভাব বজায় রাখিতে পারিতেন। তা তো নই—তা যদি হইতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার শিবতুল্য স্বামীর এমন দুরবস্থা হইত না। আমি তাঁহাকে শোধরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম কি? পাছে অপমানিত হই, এই বৃথা ভয়ে সে চেষ্টা করি নাই; প্রথম প্রথম যদি সকল লাঞ্ছনা সহ্য করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহাকে ভাল পথে আনিবার চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে তাঁহার অবস্থা কখনই এত মন্দ হইত না। তা কখনও করি নাই। করি নাই বলিয়াই আজ আমার এমন দশা। তখন বুঝি নাই যে, আমার বুক জুড়িয়া স্বার্থপরতা ভালবাসার সাজ পরিয়া বসিয়া আছে। দিদি! তুমি তো দেবতা, বল দেখি, আমাদের যে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক সে কি কেবল ইহকালের দুদিনের সুখের জন্য—তা যদি হয়, তাহা হইলে কেনই বা আমরা কষ্ট সহিব? কিন্তু যদি তা না হয়, যদি সেই সম্পর্ক জন্মজন্মান্তরের হয়, তবে ইহকালের একটু কষ্টকে সর্ব্বস্ব ভাবিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য লোকে এত ব্যস্ত কেন? আমরা যদি একবার কর্ত্তব্য-পথ-ভ্রষ্ট হইয়া বাবুগিরির দিকে—নিজেরই দিকে ঝুঁকিয়া পড়ি, তো পুরুষেরা কি আমাদের সামলাইতে পারিবে? তা পারিবে না। আমরা যদি পথ হারাই, তাহা হইলে, জানি না, আমাদের সোণার দেশ কি লইয়া আর জগতের কাছে মুখ দেখাইবে? আমরাই ভারতকে বজায় রাখিতে পারি, আবার আমরাই

চকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পুণ্যভূমি থেকে ভোগ-ভূমিতে নামাইয়া আনিতে পারি। পুরুষেরা ভোগ লইয়া যদি পাগল হয় তাই বলিয়া কি আমরাও তাই হইব? পুরুষেরা যদি আমাদের নামাইয়া দিতে চাহে তো আমরাও কি তখনই নামিয়া যাইব? আমরা তাহাদের টানিয়া উপরে না তুলিলে কে তুলিবে?

আমি বেশ বুঝিয়াছি যে, আমি আমাদের দেশের আদর্শ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছি, তা নইলে আমি আর্য্য নারী হিন্দু স্ত্রী, আমার স্বামীকে উদ্ধার করিতে পারিলাম না কেন? নিজে মাটীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়া তাঁহাকে উর্দ্ধে টানিয়া লইতে পারিলাম না কেন? পারি নাই বলিয়াই তো তিনি আমার কাছ হইতে দূরে সরিয়া গেলেন। পুরুষের শক্তি কতটুকু? কথায় বলে "মহামায়ার ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে"—আমি সেই মহামায়ার অংশ হইয়া আমার সর্ব্বস্বধন—যিনি আমার ফাঁদে পা দিয়া বসিয়াছিলেন—তাঁহাকেও ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না—তিনি অমৃত ছাড়িয়া বিষ পান করিতে লাগিলেন, আমি তাহার প্রতীকার করিতে পারিলাম না? এ দোষ কি শুধু তাঁহারই? জগতের লোকে হয় তো তাই বুঝিবে, আমিও তাই বুঝিতাম, কিন্তু এখন বুঝিয়াছি, তা কতক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়, ইহাতে আমারও দোষ আছে বৈকি। আমি পুরাণে পড়িয়াছি যে, কামোন্মত্ত বিশ্বামিত্রকে উদ্ধার করিয়াছিলেন তাঁর সতী স্ত্রী, কলিগ্রস্ত নলকে উদ্ধার করিয়াছিলেন দময়ন্তী, সে কত কষ্ট কত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া। আমার আরও করিবার ছিল, আরও সহিবার ছিল, তা করিতে ও সহিতে পারিলে হয়তো আমার স্বামীর এতদূর পতন হইত না। আমি ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া বলিতে পারি, নিজের দিকে আমার দৃষ্টি থাকিলেও আমি কায়মনোবাক্যে কখনও তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কাহাকেও জানিতাম না। তথাপি তিনি যে আমাকে অবহেলা

করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁর আজ এই অবস্থা এই শাস্তি; আর আমিও যে নিজের কর্ত্তব্য পূর্ণ করি নাই তাই আমারও এই শাস্তি; তিনি সূক্ষ্মদর্শী ভগবান্। তাঁহার কাছে তো কিছুই লুকান থাকে না। দিদি, বাহিরের লোক যাহাই মনে করুক, অন্য সময়ে আমি যাহাই মনে করিতাম, এখন জানিলাম যে, সেই সূক্ষ্ম বিচারকের হাত কেহই এড়াইতে পারিবেন না, তাঁর চক্ষে তো সব মলাই ধরা পড়ে। তা সত্য কথা বলিতে কি, আমি যে তাঁহাকে একটু হীন চক্ষে দেখিতাম না তা ধর্ম্মতঃ বলিতে পারি না, মনে আমার হইত বৈকি যে, আমি এমন গুণবতী আমার মনে কষ্ট দিয়া কি তাঁর ভাল হইবে? যে দেশে সাবিত্রী যমের হস্ত হইতে স্বামীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, মা সতী রাণী পতিনিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই দেশেই—সেই দেশের ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম আমার—আমার কি ঐ ভাব মনে আনা ভাল হইয়াছিল? তাই আমার এই দুর্দ্দশা। আজ্‌কালকার পুরুষগুলা বাবুয়ানির নেশায় দেশের হিতাহিত ভুলিয়া যাইতেছে, দেশের যাহাতে চিরন্তন কল্যাণ তাহা ভুলিয়া অশান্তি ডাকিয়া আনিতেছে, তাহাই তাহাদের কাছে কুসংস্কার যাহা তাহাদের মনের মত, তাহাদের নবভাবের পোষক নহে। তাই বলিয়া কি আমরাও আমাদের চিরপ্রচলিত আদর্শ, ইহকাল পরকালের কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাইব?

যাক্ ভাই, ওসব কথা—তোমার কাছে মনের আবেগে কত কথা বলিয়া ফেলিলাম। অপরাধ লইও না, কারণ তুমি আমার শুধু দিদি নও, তুমি আমার কাছে দেবতা, তোমার কৃপা না পাইলে আমরা কোথায় থাকিতাম? তা ভাই আমার জ্যাঠামো তুমি কি একটু সহিবে না?

এখন উঁহার কথা বলি। আজ্ তাঁর কথা বলিতে বড় আনন্দ হইতেছে—যে কষ্টে তাঁহাকে ফেরৎ পাইয়াছি তাহা তুমি তো বুঝিতেই

পাইতেছে। আজ্ কয়দিন তাঁর বেশ জ্ঞান হইয়াছে। সেই জ্ঞানের সহিত তাঁর মনে প্রবল অনুশোচনা আসিয়াছে—কেবলই বলিতেছেন "আমায় কেন বাঁচাইলে, এই কালামুখ আর জগতের সমক্ষে কি করিয়া দেখাইব? আমার যে মৃত্যুই মঙ্গল, আমার মত চণ্ডালের আবার বাঁচা কেন? তুমি আমায় স্পর্শ ক'রো না, আমি নরকের কীট, তুমি দেবতা, আমায় স্পর্শ করিলে তোমার দেহ অপবিত্র হবে। কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাকে তাঁহার শিয়রে দেখিয়া তাঁহার মুখে যেন আনন্দের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর কি মনে হইতেছে জান—দেখো দিদি, যেন এ চিঠি কাহাকেও দেখাইও না, তা হ'লে আমি লজ্জা পাব—যদি শক্তি থাকিত তাহা হইলে জয়দেবের পালার অভিনয় করিতেও ক্ষান্ত হইতেন না বোধ হয়। আমি কাঁদিতাম—আর কি করিব? কথার কি উত্তর দিব? আমার সকল অভিমান দূর হইয়া যাইত, আর মনে মনে বলিতাম—তুমি কি বুঝিবে প্রভু, আমি তোমায় কত ভালবাসি, আমি কি তোমার উপর রাগ করিয়াছি যে, আমার কাছে ক্ষমা চাহিতেছ—ভাল বাসিলে কি রাগ করা যায়? হরি তোমায় ভাল রাখুন এই আমার কামনা, আর কোনও কামনা নাই। তিনি কিন্তু ছাড়েন না, হাত দুটী ধরিয়া বার বার বলেন—"বল বল আমায় ক্ষমা করবে, আমি একটা অপদার্থ, একটা কুটা বৈত্তো নয়, আমার দোষ লইও না, আমি উচ্ছন্ন গেছি, তুমি মাপ কর, তা হ'লেই আমি সুখে ম'রতে পারব।" দিদি আজ্ আমার এত দুঃখেও হাসি আসিতেছে—এই তো পুরুষের মর্দ্দানি, আমাদের কৃপা কটাক্ষ না হ'লে তাঁদের চলে না, অথচ বড় বড় কথা কত? আমি নানা কথায় তাঁহাকে শান্ত করিলে তবে তিনি নিশ্চিন্ত হইতেন। দিদি আশীর্ব্বাদ কর যেন এ সুখ আমার অদৃষ্টে স্থায়ী হয়, যেন বিদ্যুতের আলোকের মত প্রকাশ হইয়াই

নিভিয়া না যায়। দিদি, অনেক কাঁদিয়াছি, আশীর্ব্বাদ কর যেন আমি একটু হাসিতে পারি, মরিবার আগে যেন একটু হাসিয়া যাইতে পারি, যেন তাঁহার মুখে আবার হাসি দেখিয়া মরিতে পারি, যেন আমার বাছাদের আর কষ্ট না হয়।

আর কি লিখিব, তোমাদের আশীর্ব্বাদে তিনি দিন দিন ভাল হইতেছেন, আর ছেলেরা সব ভাল আছে। ইতি

তোমার ছোট ভগিনী

সুহাসিনী।

১৩

অক্ষয় বাবুর কথা।

ইহার কিছু দিন পরে সতীশ ফিরিয়া আসিল। তাহার হস্তে সুহাসিনী আমার স্ত্রীর নামে একটী পত্র দিয়াছিলেন, সে সেই পত্র দিয়া নিজের বাসায় চলিয়া গেল। সুহাসিনী লিখিয়াছিল "দিদি তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন; আমি তাঁহাকে আরও কিছু দিন এখানে থাকিতে জেদ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মতি দিলেন না, তিনি বলেন কত দিন বসিয়া থাকিবেন? আমি তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য ধরিয়া বসিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তাহাতেও রাজী হইলেন না, বুঝিলাম তাঁহার মনে নিজের প্রতি বিশেষ সন্দেহ—সঙ্গে সঙ্গে নিজের উপর ধিক্কার আসিয়াছে। বাবাও আমাকে কিছুতেই যাইতে দিতে চাহিলেন না। বাবা বলেন "এখন গিয়া কাজ নাই, যদি ও সামলায়, কাজ কর্ম্মে মন দেয়, তখন তো যাইলেই হইবে।" আমার প্রতি অগাধ স্নেহ তাঁহার হৃদয়ে—তিনি আমার কষ্টের কল্পনাও মনে স্থান দিতে পারেন না, কাজেই তিনি ঐ বিধান করিলেন। উনিও বলিলেন যে, এখন তাঁহার মক্কেল ছাড়িয়া গিয়াছে, আর নাই, সেখানে গিয়া কি করিয়া চালাইবে, পসার যদি ফিরিয়া আসে তখন গেলেই চলিবে। যদি ছেলে গুলো না থাকিত তো আমি হয়তো কারও কথা শুনিতাম না, তাঁর সঙ্গে নিশ্চয় যাইতাম, কিন্তু কি করি আমার যে হাত পা বাঁধা, ছেলে গুলোকে ছেড়ে কেমন ক'রে যাই, আর ছেলে গুলোকে নিয়ে গিয়েই বা উপবাস করাই কি করিয়া। ও মানুষের উপর তো

আর বিশ্বাস নাই। ডাক্তারেরা তাঁহাকে মদ একেবারে ছাড়িতে বলিয়াছে, তিনিও এখন ঐ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমি শুনিয়াছি ডাক্তারেরা বলেন যে, ঐ রোগ হইলে নাকি মদ খাওয়ার প্রবৃত্তি আরও দ্বিগুণ হয়, এবং রোগ ফিরিবার ভয়ও যথেষ্ট আছে। তাই মনে মনে বড় একটা কাতরতা আসিয়াছে—প্রাণে বড় অনিষ্ট-শঙ্কা জাগিতেছে। উনি যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছেন যে, যদি আবার সকল দিক্ সাম্‌লাইতে পারেন তবেই আবার দেখা হইবে, নচেৎ এই শেষ দেখা। কথাটা শুনিয়া অবধি যেন আমার অন্তরাত্মা শুখাইয়া গিয়াছে—সত্যই যদি তাই হয়? তবে আমারও কি এই শেষ দিদি, এই শেষ স্বামি-সোহাগ, এই শেষ স্বামি সেবা? ভগবান্ করুন—তাঁহার ও কথা মিথ্যা হ'ক্, তিনি আবার ভাল হইয়া সকলের মুখ রক্ষা করুন, জীবনে মরণে আমার আর কোনও সাধ নাই।"

আমার মনেও ঐ আশঙ্কা আপনা হইতেই উত্থিত হইতে ছিল। সতীশ কি মদ না খাইয়া থাকিতে পারিবে? সেখানে যাহাই বলিয়া আসুক, এখানে যে সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবে, তাহা তো মনে হয় না; তাহার আর ইচ্ছা-শক্তি নাই বলিলেও চলে, অদৃষ্ট-কর্ণধার তাহার প্রবৃত্তি-তরণীকে যে দিকে লইয়া যাইবে, সেই দিকেই সে যাইবে, তাহার এমন ক্ষমতা নাই যে, সে গতির প্রতিরোধ করে। আমি না ইচ্ছা করিলেও, মানস-নেত্রে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম যে, মাঝসাগরে তাহার জীবন-তরণী ডুবিয়া যাইতেছে; তাহার সাধ্য নাই যে, সে প্রলয়ের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করে।

সতীশকে আমি অনেক বুঝাইলাম, তখন সেও আমার কথায় সায়

দিয়া গেল। দিন কতক সে কাজ কর্ম্ম করিল, কিছু পয়সাও উপার্জ্জন করিল। আনন্দের সহিত এ সংবাদ আমরা সতীশের স্ত্রীর কাছে পাঠাইলাম। ঐ পত্রের উত্তরে সে একটা বড় শোক সংবাদ লিখিল :— বৃদ্ধ অভয় হঠাৎ মারা গিয়াছে। বুড়া যেন মরিয়া বাঁচিল, এত দিন সে নিতান্ত মনমরা হইয়াছিল। এ সংবাদ আমি সতীশকে দিলাম, সে শুনিয়া বড় দুঃখিত হইল। তার পরেই দেখিলাম যে, সে মদ খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্রমে ক্রমে তাহার পূর্ব্বাভ্যাস সব প্রকাশ পাইতে লাগিল, অতি কুৎসিত সঙ্গী জুটিতে লাগিল, ছোটলোকেরা বেশ আসর জমাইয়া লইল; আবার সে পিচ্ছিল পথে পদার্পণ করিল।

একদিন কোনও একটা পর্ব্ব উপলক্ষে বার লাইব্রেরীতে গিয়া দেখি— সতীশ বেশ মাতাল হইয়া বক্তা হইয়াছে, সকলকে ডাকিয়া ইংরাজী বোল ছাড়িতেছে—

"We have naught else to think on
And so dear friends, copartners in my travail,
Drink hard."

বুঝিলাম যে সুহাসিনীর অদৃষ্ট ভাঙ্গিয়াছে, তাহার প্রাণের আশঙ্কা বুঝি অচিরেই ফলবতী হয়। বুঝিলাম যে "মহাসিন্ধুর ওপার হ'তে" সতীশের আহ্বান আসিয়াছে। "হাতেম তাই" পুস্তকে পড়িয়াছি যে, মৃত্যুরূপী পর্ব্বত যদি "জাম জাম" বলিয়া ডাকিল, তো জামের মধ্যে নাই যে, সে আহ্বান উপেক্ষা করে, তাহাকে সেই পর্ব্বতের গহ্বরে মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করিতেই হইবে; সতীশও সেই মৃত্যু-পর্ব্বতের আহ্বান শুনিয়াছে, আর কেহ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না।

কিসে কি হয় তা তো আজ্‌ও বুঝিতে পারিলাম না। কোন্‌ একটা সামান্য ঘটনা হইতে কত বড় ফল প্রসূত হয়, তাহা কে বলিতে পারে? যে ঘটনা পূর্ব্বে হয়তো কত বার ঘটিয়াছে, অথচ তাহার কোনও ফল দেখা যায় না, অন্য সময় সেই ঘটনা হইতেই বিষময় ফল ফলিতে দেখা যায়। সতীশের সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ, একটী ঘটনা ঘটিল। কতবার তো সতীশকে কত লোকে গালি দিয়াছে—মাতাল বলিয়া ভৎর্সনা করিয়াছে, কিন্তু সে হয় মাতাল অবস্থায় তাহা গ্রাহ্য করে নাই, না হয়, সে সব কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছে, কিন্তু এবার নাকি মৃত্যু তাহার শিয়রে, তাই ঐরূপ ভৎর্সনা উপলক্ষ করিয়া সে একটা কাণ্ড বাঁধাইল। সে যে কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড তাহাই পরে বলিব! এখন তাহার পূর্ব্বাভাস মাত্র দিয়া রাখি। একদিন সে রক্তাক্ত কলেবরে বার লাইব্রেরীতে উপস্থিত হইল, এবং মহা গণ্ডগোল করিতে লাগিল। সে তখনও টলিতেছে, তাহার মুখে যতটুকু প্রকাশ পাইল তাহাতে জানিতে পারিলাম যে, তাহাকে বাউরীরা প্রহার করিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিয়াছে। সে ঐরূপ অবস্থাতেই সেই রক্তমাখা বেশে জজ সাহেবের আদালতে উপস্থিত হইয়া বড় কেলেঙ্কারী করিল, যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা উহাকে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া আনিলেন। নীচে আসিয়া সে অনেক কথা বলিতে লাগিল; উহার প্রলাপ ও অন্যান্য লোকের কথা হইতে জানিতে পারিলাম যে, সে সেই দিন সকাল হইতেই কতকগুলা বাউরীর সহিত মদ্যপান করিতেছিল, ঐ বাউরীদিগের মধ্যে কতকগুলার কোনও একটা স্ত্রীলোক লইয়া সতীশের সহিত মনোমালিন্য চলিয়া আসিতেছিল, ঐ স্ত্রীলোকটা সতীশের বাটীতে রাত্রে থাকিত, শুনিতে পাইলাম যে সে সতীশের রীতিমত সহচারিণী হইয়া গিয়াছিল—কি ঘৃণা! যাহা হউক, তাহারা

মন্ত্রপ্রাশন কালে একটা ছুতা ধরিয়া সতীশকে প্রহার করিয়াছিল, প্রহার করিয়া রক্তপাত করিয়া দিয়াছিল। সেই অবস্থাতেই সতীশ আদালতে আসিয়া ঢলাঢলি করিল। শুধু তাহাই নহে। তাহার মাথায় জিদ চাপিল, সে ঐ লোকগুলার বিপক্ষে নালিশ করিবে। আমরা অনেক বুঝাইলাম, কিন্তু কিছুতেই সে শুনিল না, যাহা নিজের দুর্বুদ্ধিতে ঘটিয়াছে, তাহা আর আদালতে প্রকাশ করিয়া হাস্যভাজন, নিন্দা-ভাজন হওয়া যে ভাল নহে তাহা সে কিছুতেই বুঝিল না, একে চিরকেলে গোঁয়ার, তার উপর এখনও মদের ঝোঁক রহিয়াছে, কাজেই হিতকথা কে শোনে? সে নালিশ করিল, এবং হাকিম সকল অবস্থা বুঝিয়া তাহার অভিযোগ নামঞ্জুর করিলেন।

আমাদের মাথা যেন কাটা গেল, লজ্জা রাখিবার স্থান পাইলাম না। অভিযোগে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া যখন সে ফিরিয়া আসিল, তখন আমাদের যিনি নেতা তিনি সতীশকে বড় অনুযোগ করিলেন, বলিলেন "তুমি আমাদেরও মাথা হেঁট করিয়াছ, নিজে তো উচ্ছন্ন গেছই, আমাদের লজ্জা দিলে কেন? তোমার অত্যাচার আমরা অনেক সহিয়াছি, আর সহ্য করা যায় না। তুমি আমাদের কলঙ্কস্বরূপ, তোমাকে আর বার লাইব্রেরীতে বসিতে দিব না, তোমার নাম কাটিয়া দিলাম, তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও, ছোটলোক হইয়াছ, ছোটলোকের সঙ্গেই তোমায় সাজিবে, ভদ্র সমাজে আর মুখ দেখাইতে আসিও না, অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিব।"

সতীশ চুপ করিয়া কথাগুলা শুনিল। বোধ হয় নানা ঘটনায় তাহার নেশা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল, বোধ হয় নিজের মনেও একটা ধিক্কার আসিয়াছিল, তাই সে হতভম্ব হইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল, বাক্য ব্যয়

করিল না। তাহার পর সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া, উঠিয়া চলিয়া গেল; কোথায় গেল তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না। পরে জানিয়াছিলাম, যে সেই যাওয়াই তাহার কাল হইয়াছিল। আমরাই সতীশের অদৃষ্ট-চক্রের শেষ আবর্ত্তনের হেতু হইলাম, তাহা অবশ্যই তখন কেহ ভাবিতে পারি নাই; কিন্তু মানুষের দৃষ্টিশক্তিই বা কতটুকু?

১৪

সতীশের কথা।

ঠিক কথা, আমি সত্যই তো ভদ্রলোক নামের কলঙ্ক, মথুর বাবু যা বলিলেন তা তো সত্য। উঃ আমি কি হইলাম, কি করিলাম? আমি আর লোকালয়ে মুখ দেখাইব না, কিছুতেই না। একবার ফিরিবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে হয় না? বৃথা—বৃথা সে কল্পনা, আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছি, শত চেষ্টা করিয়া হারিয়াছি, আর আমার বুদ্ধি শুদ্ধিও নাই, আর আমার কোনও শক্তিই নাই, আমার পাঁজর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বৃথা চেষ্টায় কি হইবে? তা যখন পারিবই না, তবে আর বাঁচিয়া ফল কি? নেশা কাটিয়াছে, এখন সব বুঝিতে পারিতেছি, বুঝিতেছি যে এ ঘৃণিত জীবন রাখিয়া আর কোনও ফল নাই।

এই কথাই ভাবিতে ভাবিতে বাসায় ফিরিলাম—আসিয়াই প্রথমে প্রেতিনীটাকে তাড়াইলাম; উঃ, এতদিন কি করিয়া ঐ প্রেতিনীর সহবাস করিয়াছি, আজ্ হঠাৎ মাথায় ইহাই ঘুরিতে লাগিল। আমার বাসা—যেখানে আমার দেবী বাস করিতেন, যেখানে আমার পরমানন্দ সন্তানেরা আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া দিত, সেই আবাসভূমি এখন ভূত প্রেতের বাসা হইয়াছে; আজ্ সেই ভূত প্রেত দূর করিয়া দিলাম। একমুহূর্ত্তে আমার ভূতের জীবনটা অবিকৃতভাবে আমার চক্ষের উপর ঝলসিয়া উঠিল! আমি নিজের যথার্থ রূপ দেখিতে পাইলাম—সে স্বরূপ দেখিয়া আর আমার বাঁচিবার সাধ রহিল না। জগতের বুক

হইতে একটা নরপিশাচ সরিয়া যাওয়াই মঙ্গল। হায়! আমি কি করিলাম? যে সোণার প্রতিমাকে হৃদয়-দেউলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া

দূরে রও উর্দ্ধে রও দেবী হয়ে পূজা লও

পূজিবার দেহ অধিকার।

বলিয়া ভক্তিনম্র পূজোপহার দেওয়া আমার উচিত ছিল, সেই প্রতিমাকে জোর করিয়া ফেলিয়া দিয়া সেখানে প্রতিষ্ঠিত করিলাম কি না একটা পিশাচীকে, ধিক্ আমাকে শত ধিক্; সেই অপবিত্র মন্দির তবে আর রাখি কেন? যে দেহ একদিন সেই দেবতার স্পর্শে হাস্যোজ্জ্বল ছিল. সেই দেহ পিশাচীকে বিলাইয়া দিয়াছি, সেই পিশাচীর উপভুক্ত দেহ আর রাখি কেন? এই কলুষিত দেহ-পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া ফেলাই ভাল। যখন বসিয়া বসিয়া আমার সমব্যবসায়ীদের ধিক্কারোক্তি শুনিতেছিলাম, সেই মুহূর্ত্তেই আমার সহসা আত্মচেতনা জাগিয়া উঠিল। আমি সব দেখিতে পাইলাম, দেখিতে পাইয়া অবধি আমার হৃদয়ে এত নরকের যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে যে. সে যন্ত্রণা সহ্য করিবার শক্তি আর আমার নাই; সেইক্ষণ হইতেই আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, এই সর্ব্বজন ধিকৃত জীবনভার বহন করা আর হইতে পারে না। আমাকে মরিতেই হইবে। যে অদৃশ্য শক্তি এতদিন আমায় ভূতের নাচ নাচাইয়াছে. সেই আজ্ স্পষ্টাক্ষরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছে—"আজ্ তোর ভূত ছাড়িবার দিন, আজ্ তোর মৃত্যুরোগ ধরিয়াছে, আর তোর নিস্তার নাই।" আমাকে মরিতেই হইবে। এ মুখ আর যেন কেহ দেখিতে না পায়। আত্মগ্লানিতে হৃদয় পুরিয়া গিয়াছে; মৃত্যু ভিন্ন তাহার হাত হইতে নিস্তারের আর উপায় নাই!

কিন্তু মরিবার পূর্ব্বে একটা কাজ করিয়া যাওয়া ভাল, আমার পাপ-জীবনের ইতিহাসটা লিখিয়া যাই, যদি আমার মত আর কোনও

দুর্ব্বল জীব থাকে, তাহা হইলে এ জীবন হইতে অনেক শিক্ষা পাইতে পারিবে, তাই এতটা লিখিয়া ফেলিয়াছি—এও একটা মাতালের ঝোঁক বোধ হয়। যাহা হউক, একটা কথা বলিয়া যাই—এ কাহিনী কোনও একটা কল্পিত গল্প নহে, ইহার প্রতিবর্ণ সত্য, কোথাও অতিরঞ্জিত নয়। ব্যস্, আমার কার্য্য ফুরাইয়াছে—এবার যাইবার জন্য প্রস্তুত হই।

"একবার তাদের দেখে এলে হয় না" মনে মনে এই ভাবটা বে বড় জোর করিয়া উঠিতে লাগিল, কি করি? একটু মদ খাই, মদ খাইয়া একটু চিত্ত স্থির করি। ছি ছি! আবার কিনা এই কলঙ্ক-কালিমা-মাখা মুখ তাহাদের দেখাইতে যাইতেছি! আর কেন? আবার এই নারকীয় লোকের সংসর্গে তাহাদের আনিয়া কি হইবে? আমার গায়ে নরকের গন্ধ, প্রতি অস্থিতে নরকের ময়লা, পিশাচীর সঙ্গগুণে প্রাণে পৈশাচিক লালসা, আমার কি এ সংসারে স্থান আছে? এ সংসার হইতে অনেক দূরে, যেখানে আলো নাই, যেখানে কেবল নিশ্বাস, কেবল আর্ত্তনাদ, যেখানে চন্দ্র সূর্য্য উঠে না, যেখানে কেবল প্রলয়ের হুঙ্কার, আমার স্থান যে সেইখানে, আমার কি সংসারে থাকা আর সম্ভব? না—কিছুতেই না—কিছুতেই আর তাহাদের কাছে মুখ দেখান হইতে পারে না—তাহারা জানুক যে, আর আমি তাহাদের জ্বালাইতে যাইব না, আর আমার জন্য তাহাদের মাথা হেঁট হইবে না। আমার চক্ষে সংসার নিভিয়া গিয়াছে, প্রাণে আর কিছুতেই সাড়া নাই; কেবল জ্বালা—জ্বালা—নিদারুণ যন্ত্রণা—অসহ্য যন্ত্রণা, সে যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারি না। বেশ তো অজ্ঞান ছিলাম, ঘোর বিকারগ্রস্ত ছিলাম, এত যন্ত্রণা ফুটাইবার জন্যই কি সহসা জ্ঞানোদয় হইল? সেই বাল্যকাল হইতে আজ্ পর্য্যন্ত যা করিয়াছি, সকল কথা মুহূর্ত্ত মধ্যে মনে জাগিয়া উঠিয়া হৃদয় জ্বালাইয়া খাক করিয়া দিল। দারুণ পিপাসা, আবার

মদ খাই। এস সুরা, যার উপাসনায় জগতের সব ভুলিয়াছি, এই শেষ মুহূর্ত্তে বন্ধুর কাজ কর, স্মৃতি লোপ করিয়া দাও, মনে যেন আর কোনও সাড়া না পড়ে, কোনও স্মৃতি না উঠিতে পারে। যদি উঠে, তবে তো মরিতে পারিব না; সেই মুখখানি মনে পড়িলে যে আর মরিতে পারিব না। উঃ, এখনও স্মৃতি আছে, আমার হৃদয়-রাণীর স্মৃতি, আমার বাছাদের স্মৃতি, সব যে উজ্জ্বল ভাবে জাগিয়া রহিয়াছে। একবার এ সময় যদি দেখা পাইতাম, তবে তাহার কাছে আত্ম-নিবেদন করিয়া শেষ দিনে জীবন ধন্য করিতাম, যদি পরজন্ম থাকে তাহা হইলে একটা কিছু স্মরণ রাখিবার মত কাজ করিয়া যাইতে পারিতাম। তা তো হইল না, সে রহিল স্বর্গে আর আমি নামিয়া গেলাম নরকের নিম্ন স্তরে, সে কি আর এ নরকের কীটের কাছে আসিবে? ও গো একবার এস, দেখে যাও, মর্‌বার আগে আমার জীবনে কি আগুন জ্বলেছে—কি দারুণ অনুতাপে প্রাণ জ্বলিয়া যাইতেছে। একবার যদি দেখা পাই, উঃ! এ নরক-যন্ত্রণা সব নিভিয়া যায়—সব দূর হইয়া যায়! একবার কি আসিবে না? দেখিবে না তোমার মত দেবীকে কষ্ট দিয়া—অপমান করিয়া—আমার কি জ্বালা? না না তুমি কোথায়, আর আমি কোথায়? তুমি শুধু ঐ স্বর্গ-লোক থেকে এ অধম পাপিষ্ঠ ঘৃণিত জীবকে ক্ষমা কর, সেই ক্ষমার বলে আমি যদি মহানরকে থাকি, পুড়িয়া ছাইও হইয়া যাই, তবু আমি শান্তি পাইব; আমার অস্থি, আমার চিতাভস্মগুলা, শান্তি পাইবে। এ কি! এত দুর্ব্বল আমার চিত্ত, যে, ঐ স্মৃতি মনে আসিতেই আবার বাঁচিবার ইচ্ছা হয়। আবার ছুটিয়া তার চরণে লুটাইবার ইচ্ছা আসে। না, না, তা কখনও হবে না, আমি মরিয়া তাহাকে অশেষ বিড়ম্বনার হাত হ'তে মুক্ত করিবই। আমি মরিয়া গেলে তাহার মনে নিত্য নব আশঙ্কা থাকিবে না, নিত্য

মাথা হেঁট হইবার ভাবনা থাকিবেনা, তাহার মনে কতক শান্তিও আসিবে। এতদিন মদে পাগল করিয়া রাখিয়াছিল, এইবার মদ যেন আমার পক্ষে তীব্র হলাহল স্বরূপ হয়, মদ খাই, সব ভুলিয়া যাই। অমৃতের স্মৃতির লেশ মাত্র থাকিতে তো মরিতে পারিব না। সে অমৃতের আস্বাদ মুখে থাকিতে মৃত্যু আসিবে কেন? আমার কি কোনও দিকেই কোনও শক্তি নাই? চ'খে জল আসে কেন? সেই অমৃতময়ীর কথা ভাবিতে গেলেই চ'খে জল আসে কেন? ছেলে-গুলোর কি ক'রে গেলাম ভাবিলেই প্রাণে কম্প আসে কেন? আবার চেষ্টা করিয়া দেখিব নাকি? নরকের কুকুর! আবার তুমি তোমার পাশব দংশনে তাহাকে জ্বালাতন করিতে চাও,—চেষ্টা, চেষ্টা, কত চেষ্টাই তো করিয়াছি, চেষ্টা করিয়া আরও তলাইয়া গিয়াছি, আবার সেই চেষ্টার নামে, চেষ্টার ভাণে এই পশুর জীবনটা টানিয়া রাখিতে চাই। না তা হবে না; ভগবান্‌কে কখনও ডাকি নাই; মানি নাই; আজ্ ডাকিয়া বলিতেছি, যদি তুমি থাক তো আমার হৃদয়ে এইটুকু বল দাও, যাহাতে আমি স্থিরচিত্তে এই ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, পদদলিত জীবনটা অনায়াসে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতে পারি, যেন এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণটা লইয়া আর কারও কাছে দাঁড়াইতে না হয়, যেন আমার জন্য আমার স্ত্রী পুত্র পরিবারের, আমার বন্ধুবান্ধবের আর লজ্জা পাইতে না হয়। আমি মরিব, তাতে কার কি ক্ষতি? তবে মরিবার মত শক্তি পাইব না কেন? হে অদৃশ্যশক্তির এতদিন চক্ষু থাকিতেও অন্ধ করিয়া রাখিয়া আজ আবার সে চক্ষু খুলিয়া দিলে কেন? আজ্ যাই ধরা-বক্ষ হইতে এ করাল ধূমকেতুটাকে মুছিয়া ফেলিব মনে করিতেছি, অমনি তুমি বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য আমার সম্মুখে খুলিয়া ধরিতেছ কেন? এতদিন যাহাদের মনের কোণেও স্থান দিই নাই, আজ্ তাহাদের পুঞ্জীভূত স্নেহের দাবী

আমার প্রাণে আসিয়া আমার মরণ সংকল্পকে শিথিল করিতেছে কেন ?
আজ তোমার মত প্রাণতান সুর আমার কাণের কাছে বাজাইয়া রাশি রাশি ফুলের গন্ধে প্রাণ আমোদিত করিয়া একি তোমার খেলা ? আমার তো এ সবই ছিল, পাখীর গান, ফুলের বাস, বীণার তান, কি ছিলনা আমার ? কি না হইতে পারিত আমার ? তুমি তখন এ সব কোথায় লুকাইয়া ফেলিয়াছিলে ? সে সব লুকাইয়া আমাকে লইয়া পিশাচের খেলা খেলাইলে কেন ? আমার ভিতরকার মনুষ্যত্বটুকু একেবারে লুপ্ত করিয়া দিলে কেন ? যদি দিয়াছিলে, তো আজ আবার সে সকল স্মৃতির তরঙ্গ এ দুরন্ত হৃদয়ে তুলিয়া তোমার কি লাভ হইল ? আজ এই শেষ দিনে উপহাস কেন ? যা নিজে ইচ্ছা করিয়া পদদলিত করিয়াছি, তা আবার চ'খের সামনে কেন ? না না আমি মদ খাই, মদ খাইয়া ও সব দৃশ্য ভুলিয়া যাই ! আয় তবে পিশাচী এ নরকে তো তোরই স্থান, আর স্বর্গের ছবি উঁকি ঝুঁকি মারে কেন ? আয় আজ তোকে মর্ম্মান্তিক আলিঙ্গনে বাঁধিয়া—দুজনে নরক গুলজার করিতে যাই ; আয় যত পিশাচ পিশাচী সকলে মিলিয়া আমাকে ঘিরিয়া নৃত্য কর, আমি সেই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে নরকে যাই, ও স্বর্গের সুষমা যদি মনে জাগিতে থাকে, তা হ'লে যে মরিতেও পারিব না।

মনের ঝোঁকে লিখিয়া ফেলিয়াছি, লিখিয়া চলিয়াছি, পাছে কেহ আসিয়া আমার সংকল্পে বাধা দেয় তাই বাহিরের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করিয়াছি, এখন আমি আছি, আর আছে আমার পাপচিন্তা আর পূর্ব্বস্মৃতি, আর কেহ নাই, কি সুন্দর অবসর—মরিবার কি সুন্দর অবসর ! মাথায় যেন রক্তের স্রোত কল্ কল্ নৃত্য করিতেছে, মদ খাই সব শীতল হইবে। এস আমার চিরসঙ্গিনী, চিরসোহাগিনী এস আমার মুখে বিষামৃত ঢালিয়া দাও, তোমাকেই চিরজীবনের আদরিণী করিয়াছি, আজ্ আমার সুখের

শেষ দিন, এ দিনে তুমিই আমার একমাত্র সহচরী, এস আমাকে নরকের পথে এগিয়ে দিবে এস। আমি তোমারি জন্য সব ঠেলিয়াছি—সব হারাইয়াছি—তোমায় কি এমন শুভদিনে ফেলিতে পারি! রাক্ষসি! আমি কি ছিলাম, আমার কি ক'রেছিস্। আজ্ আমি পথের কাঙ্গাল, ভদ্র নামের কলঙ্ক, স্ত্রী পুত্র কন্যা পরিত্যক্ত, সংসারের মধ্যে অতি হেয়; এত ক'রেছিস্ তো শেষ কাজ করিয়া যা, আমার চিত্তে বল দে, যেন আমি সব ভুলিয়া—যে জগৎ আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছে, সেই জগতের বুকে লাথি মেরে—চ'লে যেতে পারি। কে আমার স্ত্রী, কে আমার পুত্র, কে আমার কন্যা? কৈ আমার স্ত্রী, কৈ আমার পুত্র, কৈ আমার কন্যা? আমার পাশে, আমার শিয়রে, আমার বুকে, ইহারা তো কেহ নাই? তবে এদের চিন্তাতে কি আমার মরা হবে না? হবে না? খুব হবে, আমি মরিলেই ত তারা বাঁচে, লোকের টিট্‌কারী থেকে বাঁচে; আমি ছোটলোক, আমি মাতাল, সকলের উপর আমি দরিদ্র, আমার আবার স্ত্রী পুত্র কন্যা থাকিবে কেন? তারা বেশ আছে, আমি নিজের পথ ধরি। আমার স্পর্শে কলঙ্ক, আমার নিশ্বাসে বিষ, আমার ছায়া মাড়াইলে পাপ; বাঃ, আমি মরিব না তো মরিবে কে?

একি আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠ্‌ছে কেন? সমস্ত শরীরের ভিতরে আগুনের হল্‌কা—বাহির হ'চ্ছে কেন? হাত কাঁপ্‌ছে কেন? আর যেন লিখ্‌তে পারি না। না আমি লিখব, আমার শেষ কথা লিখ্‌ব। উঃ! কি দারুণ শীত, এ কি কম্প! আর যে স্থির হ'তে পাচ্ছি না। এ কি হ'ল—এ কি দেখি?—কি দেখি? এ যে প্রলয়ের জল আমার চারিদিকে ছুটে আস্‌ছে—উঃ কি ভীষণ গর্জ্জন, কাণের কাছে প্রলয়ের হুঙ্কার, একশ বজ্রের ধ্বনি! আজ্ কি জগতের শেষ দিন? তাইতো, কোথায় যাব? এ যে হাজার হাজার শাপ আমাকে ঘিরে ফেলেছে।

কামড়ালে, ঐ কামড়ালে, আর রক্ষা নাই। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে, আমি যাব, পালাব, ওগো কোথায় তুমি আমায়? রক্ষা কর; আমার উপর রাগ ক'রেছ? রক্ষা কর, রক্ষা কর, বড় ভয়—ভয়ে প্রাণ যায়, ক্ষমা কর, এস একবার এস। আমি মরব না, তোমায় দেখেছি, এই প্রলয়ের মাঝে তোমায় দেখেছি, আমি মরব না।

একি আমি কি পাগল হলাম নাকি? লিখ্‌তে লিখ্‌তে এ কি বিভীষিকা দেখ্‌ছি, কি লিখ্‌ছি তাও যে আর ঠিক করতে পারচি না; আর হাত চলে না—কি ভীষণ কম্প—আর চলে না, এই শেষ—এই শেষ—অন্ধকার হ'য়ে আস্‌ছে,—আর যে দেখ্‌তে পাচ্ছি না, এলেনা, একবার এলেনা,—ঐ আবার—আবার আস্‌ছে; বাঁচাও—আমায় বাঁচাও,—লক্ লক্ ক'রে আগুন জ্বলে উঠ্‌ছে—কোথায় তুমি—রক্ষা কর—রক্ষা কর—ঐ আগুন ছড়িয়ে প'ড়েছে—ঐ ছেলেরা ছুটে আস্‌ছে—প'ড়্‌লো প'ড়্‌লো—বাঁচাও বাঁচাও,—বস্ সবশেষ,—স—ব—শে—ষ। এসেছ—এস, কৈ কে—

১৫

সুহাসিনীর কথা।

আজ্ কতদিন ধরিয়া—তাঁর কোনও খবর পাই নাই, মনটা বড় অস্থির হ'য়েছে। কে জানে মনে কেন দিবারাত্রি বিপদের আশঙ্কা জাগিয়া রহিয়াছে। কি করিলাম, ঐ রুগ্নকে একলা ছাড়িয়া দিলাম, ঐ মানুষ—কখনও যে নিজের ভাল কিসে হয় তা বুঝিতে পারেন না,—তাঁকে আবার প্রলোভনের মাঝে অরক্ষিত অবস্থায় ছাড়িয়া দিয়া কি ভাল করিলাম? যে সংবাদ পাই তাতে তো প্রাণ আরও অস্থির হয়। আবার নাকি তিনি বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন, এবার যদি ঐ রোগ আসে তাহ'লে তো নিস্তার নাই। বড় অন্যায় হ'য়েছে—তাঁকে যেতে দেওয়া বড় অন্যায় হ'য়েছে, কেন তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলাম না, সকলে মিলিয়া জোর করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতাম না কি? যদি আমি ছেলেগুলোকে নিয়া পায়ে জড়াইয়া পড়িয়া থাকিতাম, তাহা হইলে কি তিনি ছাড়িয়া যাইতে পারিতেন? তখনতো ভাল অবস্থায় ছিলেন, ভাল অবস্থায় থাকিলে তাঁহার প্রাণে যে কত মমতা, কত স্নেহ, তা তো আমি জানি, তবে কেন তা ক'র্লাম না? একেই বলে নিয়তি! নিয়তি? না কর্ম্মফল? আমার তো তখন এমন বল হৃদয়ে আসে নাই যে, তাঁহার সঙ্গে চলিয়া যাই—শত লাঞ্ছনা সহিয়াও তাঁহার পদসেবা করি! আমার স্নেহ ভালবাসার অচ্ছেদ্য বর্ম্মে তাঁহাকে ঢাকিয়া রাখিয়া সকল বিপদ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করি। তা যদি করিতে পারিতাম, তাহা হইলে তিনি কি এ রোগের পর আমাকে তাচ্ছিল্য করিতে পারিতেন,

না, আবার কুসঙ্গে মিশিতে পারিতেন? কখনই নয়। তা তো করিলাম না, তখনও নিজের আর ছেলেদেরই মুখ চাহিয়া তাঁহার দিকে চাহিলাম না, তবে আমি নিয়তির দোষ দিয়া দায়ে খালাস হইলে কি হইবে? না, আমরা মুখে বলি যে আমরা আর্য্য-পত্নী, কিন্তু কাজে অনেকটা বিলাসসঙ্গিনী হইয়া পড়িতেছি। নিয়তি আমরা নিজেই গ'ড়িয়া লইতেছি।

বাবা তাঁহার অগাধ স্নেহে আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন, মনে করিতেছেন যে, আমি তাঁহার আদরে, যত্নে, স্নেহে, সকল দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছি। পিতৃস্নেহ যে কি অপূর্ব্ব বস্তু তা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু কাকে ভুলিব? যাঁর চরণে নৈবেদ্য সাজাইয়া আমাকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিব, তাঁহাকে ভুলিয়া পিতার অন্নে শরীর ধারণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব? স্ফুটনোন্মুখ যৌবনের প্রাণঢালা ভালবাসা যাঁহাকে নিবেদন করিয়া দিয়াছি, আজ কেমন করিবা তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিব? পাছে বাবার মনে কষ্ট হয় বলিয়া লুকাইয়া চ'খের জল ফেলি, ম'নর জ্বালা মনেই লুকাইয়া রাখি, কিন্তু অহোরাত্র তাঁহারই কথা আমার মন জুড়িয়া বসিয়া আছে। তাঁহারই কাতর মুখটী স্মরণ করিয়াই আমার দিন যাইতেছে। মাঝে মাঝে প্রাণে এত যন্ত্রণা আসে যে, মনে হয় আর না—আর লোকলজ্জায় কাজ নাই, লোকে বেহায়া বলিবে তাতে ক্ষতি কি? একবার ছুটিয়া গিয়া তাঁর পায়ে জড়াইয়া ধরি—ধরিয়া বলি "তুমি আমায় মার ধর যা ইচ্ছা কর, আমায় পদদলিত করিয়া যাও তাতেও ক্ষতি নাই, আমি তোমারই—আমি তোমারই, আমার যে তুমি ভিন্ন গতি নাই, আমায় ক্ষমা কর, আমায় পায়ে রাখ";—তা যদি পারি, তো তাঁকে নিশ্চয়ই ফিরাইতে পারি। উঃ, পরাধীনতায় বড় দুঃখ—স্নেহের বন্ধন বড় কঠিন বন্ধন,—আমার প্রাণ যা করিতে চায়,

বাবার ভয়ে আর ছেলেগুলোর কথা মনে করিয়া তা করিতে পারি না। এই স্বার্থপরতার জন্যই বুঝি আমার সর্ব্বনাশ হইল, এ তো দুর্ব্বলতা; এই দুর্ব্বলতার জন্যই আমি আমার নিজের কাজ করিতে পারিলাম না, তাই আমিও গেলাম, তিনিও উৎসন্ন হইলেন। . .

আজ্ আমার প্রাণটা কেবল হু হু করিতেছে, কেবল কাঁদিবার ইচ্ছা হইতেছে কেন? উঃ, কা'ল্ রাত্রে যে দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি, তা মনে হইলে প্রাণ এখনও শিহরিয়া উঠিতেছে। আজ্ আমার সমস্ত শরীর যেন অবশ হইয়া গিয়াছে। কেহ হয়তো বিশ্বাস করিবেন না—কিন্তু সত্যই আমি কা'ল্ স্বপ্নে দেখিয়াছি যেন তিনি বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন, স্পষ্ট শুনিয়াছি যে তিনি আমায় কাতর কণ্ঠে বার বার ডাকিতেছেন, যেন কাঁদিয়া বলিতেছেন "আমায় রক্ষা কর রক্ষা কর" ঐ দুঃস্বপ্নের স্মৃতি আজ্ও মন হইতে সরিতেছে না। স্বপ্ন কি কখনও সত্য হয়? কে জানে আমার জীবনে সত্য স্বপ্ন হইয়া গিয়াছে, হয় তো স্বপ্নই সত্য হইবে। যদিও স্বপ্ন সত্য হয়, তবে আমার জীবনে অনুতাপের আর শেষ থাকিবে না। তিনি যদি সত্যই বিপন্ন হইয়া থাকেন, আর বিপন্ন হইয়া যদি আমাকে স্মরণ করিয়া থাকেন, আমি হতভাগিনী কিনা এইখানে বসিয়া বাপের আদর খাইতেছি! আমি কি কেবল তবে তাঁর বিলাসের ও সুখের সঙ্গিনী, দুঃখের সময় পলাইয়া থাকিবার জন্য আমি তাঁর দাসী হইয়াছিলাম—তিনি বিপদে একাই যুদ্ধ করিবেন, আমি নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকিব? এই আমি আমার কর্ত্তব্য করিতেছি? শুধু বসিয়া বসিয়া কাঁদিলেই কর্ত্তব্য করা হয়? স্বামীর অবস্থা খারাপ দেখিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া আসিলাম; অত্যাচারের ভাণ করিয়া তাঁহাকে শত বিপদের মধ্যে ফেলিয়া নিজের সুখ খুঁজিবার জন্য পলাইয়া

আসিয়া বড় বাহাদুরী করিতেছি, আমি হিন্দু-স্ত্রী! তবে আমি ভুগিব না তো কে ভুগিবে? এ যে আমার শাস্তির পরিবর্ত্তে শাস্তি! কে এখন আমায় তাঁর সংবাদ আনিয়া দেয়, ওঁর খবর দেওয়াটাও বন্ধ করিলেন কেন?

———

১৬

অক্ষয় বাবুর কথা।

সংবাদ দিতে হইল, কি করি, কতদিন আর লুকাইয়া রাখি—আহা, যদি এ সংবাদ না দিতে হইত, তাহা হইলেই আমার পক্ষে ছিল ভাল—সে যে বড় হৃদয়-বিদারক সংবাদ। জানিনা, এ সংবাদ পাইয়া হতভাগিনী কি করিতেছে।

সেই যে সতীশ সেদিন বার লাইব্রেরী হইতে বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া গেল, তাহার পর ১০।১২ দিন আর তাহার কোনও সংবাদ পাই নাই। ইহাতে আমাদের বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইবার কিছুই ছিল না। কারণ এমন নিরুদ্দেশ হওয়া তো তাহার পক্ষে কিছু নূতন নয়। আমরা যেমন নিজের কায করিয়া যাই তাহাই করিয়া যাইতেছিলাম, তাহার জন্য বিশেষ চিন্তিত হই নাই।

তাহার অন্তর্ধানের দিন পনের পরে যে ভদ্রলোকের বাড়ীতে সতীশ ভাড়াটিয়া থাকিত, তিনি আসিয়া আমাকে বলিলেন যে তাঁহার প্রায় এক বৎসরের ভাড়া বাকী পড়িয়াছে, সতীশ বাবুও তো অনেক দিন নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, ভাড়া পাইবারও কোনও আশা দেখিতেছেন না, অতএব তিনি অন্য লোককে বাটী ভাড়া দেওয়া স্থির করিয়াছেন, এবং আমাকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করেন; তিনি আমার এবং আরও দু একজন ভদ্রলোকের সম্মুখে বাড়ী খুলিবেন এবং সতীশের যা কিছু দ্রব্যাদি আছে, তাহা আমাদের কাছে গচ্ছিত রাখিবেন। অনুরোধ যুক্তিসঙ্গত দেখিয়া, আমি এবং আমার আরও দুই তিন জন সমব্যবসায়ী

বন্ধু মিলিয়া সতীশের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে গিয়া দেখি যে বাড়ীর দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। আশ্চর্য্য! ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া কে? খালি বাড়ী পাইয়া কেহ ইহার ভিতর কোনও কু-অভিসন্ধিতে প্রবেশ করিয়াছে নাকি? দ্বারে বার বার আঘাত করিয়াও তো কাহারও সাড়া শব্দ পাইলাম না, কেহ কপাট খুলিয়াও দিল না। মনে বড় সন্দেহের উদয় হইল। যে স্ত্রীলোকটা সতীশের সঙ্গে থাকিত, তাহাকে ডাকিয়া আনিলাম যদি কিছু সংবাদ দিতে পারে। সে বলিল "সেই যে সেদিন সতীশ তাহাকে তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল, তাহার পর যে সতীশ কি করিয়াছে, কোথায় আছে, সে সংবাদ সে রাখে না; তাহার পর হইতে সে এ দিকে আসিতে সাহস করে নাই, কারণ সতীশের সেদিনকার মূর্ত্তি দেখিয়া সে বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল যে, সে সেখানে পুনরায় আসিলে হয় তো সতীশ তাহাকে উৎপীড়ন করিবে। সে মিথ্যা বলিতেছে বলিয়া বিশ্বাস হইল না। কাজেই কবাট ভাঙ্গা ভিন্ন আর কোনও উপায় দেখিলাম না। এ কার্য্যের জন্য পুলিশের প্রয়োজন বুঝিয়া থানায় খবর দিলাম, থানার লোক আসিয়া কপাট ভাঙ্গিল, আমরা সকলে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। এ ঘর ও ঘর করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, জিনিষ পত্র তো বড় কিছু ছিল না, যৎসামান্য যাহা পাইলাম তাহার তালিকা করিয়া লইলাম। সব ঘরই খোলা ছিল! শেষে সতীশ যে ঘরে শুইত সেই ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখি, এ ঘরটাও ভিতর হইতে বন্ধ, ব্যাপার কি? মনে নানা আশঙ্কা উপস্থিত হইল, কে জানে কি ঘটিয়াছে। যেমন বাটীর দ্বার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করা হইয়াছিল, তেমনি এ ঘরের কবাটও ভাঙ্গিবার পরামর্শই স্থির করা গেল, কারণ এবারেও দ্বার ঠেলিয়া কোনও উত্তর বা ফল পাওয়া গেল না। দ্বার ভাঙ্গা হইল, দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার সঙ্গে

সঙ্গে-সকলের নাসারন্ধ্রে একটা বিকট জঘন্য গন্ধ প্রবেশ করিল ; একি ? ও কিও ? এ একটা মনুষ্যমূর্ত্তি নয় ? সকলেই দেখিল একটা মনুষ্য দেহ পালঙ্কে লম্বিত রহিয়াছে, আগাগোড়া লেপে ঢাকা, কেবল মাথার চুল বাহির হইয়া রহিয়াছে। পুলিশের লোকে লেপ টানিয়া খুলিয়া ফেলিল, দেখা গেল একটা শবদেহ বটে, কাহার দেহ প্রথমে বুঝিতেই পারিলাম না, দেহ হইতেই দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে, সেটা এত পচিয়া উঠিয়াছে যে, মানুষটীকে সহসা চিনিবার উপায় নাই। কি করিতে আসিলাম, কি দেখিলাম, জানিনা অজ্ঞাতে কোন্ দুর্ঘটনার মধ্যে আসিয়া পড়িলাম ! থানায় আবার সংবাদ গেল, থানা হইতে দারোগা বাবু ডাক্তার সহ উপস্থিত হইলেন। এ আবার কি ? খুন না আত্মহত্যা ? এই প্রশ্নই সকলের মনে আসিতেছিল। যখন সকলের মন এইরূপ সন্দেহ-দোলায় দুলিতেছিল, সেই সময়ে মৃতদেহের পরীক্ষা আরম্ভ হইল। মূর্ত্তি যদিও নিতান্ত বিকৃত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি বস্ত্রাদি ও অন্যান্য লক্ষণ হইতে সকলেই স্থির করিলেন যে মৃতদেহ নিশ্চয়ই হতভাগ্য সতীশের। আমি আর থাকিতে পারিলাম না, চীৎকার করিয়া উঠিলাম, সকলে আমাকে শান্ত করিয়া তদারকে প্রবৃত্ত হইলেন ; অনুসন্ধান করিতে করিতে টেবিলের উপর, এবং ঘরের চারিদিকে ছড়ান, সতীশেরই হস্তলিখিত কাগজগুলি পাওয়া গেল, সব গুলি জড় করিয়া গুছাইয়া লইয়া পাঠ করিয়া স্পষ্টই বুঝা গেল যে এ খুন নয়, আত্মহত্যা। হায় হায় কে বুঝিয়াছিল যে, সামান্য তিরস্কারের ফল এমন বিষম হইবে, কে জানিত যে, সতীশের নিত্য তিরস্কৃত কদর্য্য জীবনে, ঐ তিরস্কার এত গভীর বেদনার সৃষ্টি করিবে যে, ঐ তিরস্কারকে উপলক্ষ করিয়া সে তাহার কলঙ্কিত জীবনের শেষ করিবে।

তাহার স্বলিখিত বৃত্তান্ত পাঠে ডাক্তার মত প্রকাশ করিলেন যে,

সেই দিনকার তীব্র অনুশোচনার আঘাতই (shock) সতীশের মৃত্যুর কারণ ; সেই "শক" পাইয়া তাহার আবার delirium tremens উপস্থিত হইয়াছিল ; সেই রোগের প্রকোপে তাহার হার্ট ফেল করিয়াছিল. তাহার নিজের লেখা হইতেই জানা যাইতেছে যে, সে মর্ম্মান্তিক ধিক্কারে অভিভূত হইয়াই নিজের বৃত্তান্ত লিখিয়াছিল, উহা হইতেই জানা গেল যে সে সঙ্গে সঙ্গে মদ্যপানও করিতেছিল; তাহার শীত করিয়া জ্বর আসিয়াছিল, এবং লিখিবার কালেই সে বিভীষিকা দেখিতেছিল, তাহার পর লেখা সমাপ্ত করিতে পারে নাই, শীতের ও কম্পের বেগ অসহ্য হওয়ার লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল, আর তাহাকে উঠিতে হয় নাই। কাজেই চিকিৎসা বা সেবা শুশ্রূষারও কোনও উপায় হয় নাই। কি দুঃখ! লোকটা শেষে বিঘোরে মারা গেল, আর আমরা তাহার সংবাদ পর্য্যন্ত লওয়াও মনে করি নাই! এই রকম করিয়াই আমি সতীশের পত্নী কর্ত্তৃক ন্যস্ত কার্য্যের সমাধা করিলাম! বলিতে কি, প্রাণে বড় আঘাত পাইলাম; সে যেমনই হউক, তাহাকে যে ভাইয়ের মত দেখিয়াছিলাম। অতি যত্নে তাহার আত্মবিবরণীটা কুড়াইয়া রাখিয়া দিলাম।

সতীশের সংকার করিয়া ঘরে ফিরিলাম। আমার স্ত্রী এই বিবরণ শুনিয়া সুহাসিনীর দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। আর আমি হতভাগা, পাষাণের মত কঠিন হইয়া এই দুঃসংবাদ সতীশের শ্বশুরের কাছে লিখিয়া পাঠাইলাম। বহুদিন হইতেই নিয়তি সুহাসিনীর জন্য যে বজ্রাগ্নির সঞ্চার করিতেছিল, আমার পাপ-হস্তই তাহার কপালে সেই উদ্যত বজ্র নিক্ষেপ করিল। কি করিব ? ইহাই আমার নিয়তি!

ঐ বিবরণীর স্মৃতিতে এখনও কষ্ট হয়; কিন্তু আপনার অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না, ইন্দ্রনাথ বাবু, তাই আমি যতটুকু জানি তাহা

বলিয়া ফেলিলাম। তাহার স্বলিখিত জীবনীটাও আপনাকে দিতেছি। ইহার পর সুহাসিনীর কাছ হইতে একখানি পত্র পাইয়াছিলাম, অর্থাৎ আমার স্ত্রী পাইয়াছিলেন, তাহাও আপনাকে দিতেছি; আপনি ঐগুলি লইয়া যাহা করিতে পারেন করুন; হয় তো আপনার কার্য্যে জগতের কিছু মঙ্গল হইলেও হইতে পারে।

সতীশের লিখিত বিবরণীর শেষ অংশটা এত আঁকাবাঁকা অক্ষরে লিখিত, যে, তাহা পড়িতে পারা একটু কঠিন; তা আপনি কষ্ট করিয়া পড়িয়া লইবেন।

———

১৭

সুহাসিনীর পত্র।

শ্রীচরেণেষু—দিদি শেষকালে যথার্থই আমার কপাল ভাঙ্গিল, সকল আশা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, সব গেল অথচ আমি তো এখনও বেশ বসিয়া আছি; আমার ইহকাল পরকালের সর্ব্বস্বধন বিনা চিকিৎসায়, বিনা সেবায় পরলোকে চলিয়া গেলেন, আর আমি হতভাগিনী, এখনও সংসারে বসিয়া আছি, স্বচ্ছন্দে দুবেলা পেটে ভাত দিতেছি, এখনও তো তাঁহার কাছে যাইতে পারিলাম না। আমি কি পাপিনী, কি কঠিন আমার হৃদয়! যদি তাঁহার শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহার কাছে থাকিয়া তাঁহার চরণ সেবা করিতে পারিতাম, যদি তাঁহার মুখে তৃষ্ণার জল এক ফোঁটাও দিতে পারিতাম তবে আমার জীবন সার্থক হইত, কিন্তু এ পাপীয়সীর অদৃষ্টে তাও হ'ল না; তিনি অনুশোচনায় দগ্ধ হইয়া তাঁহার জীবনের যবনিকা আপন হাতে টানিয়া দিলেন; আর আমার জন্য আজীবন অনুশোচনা রাখিয়া গেলেন; এখন আমাকে তিলে তিলে, পলে পলে সেই অনলে পুড়িতে হইবে, তবে এখনও আমার মরণ হ'ল না কেন? আমি পাষাণী, তাই এ যন্ত্রণায় এখনও বাঁচিয়া আছি। উঃ, মৃত্যুকালে তাঁর কি যন্ত্রণাই না হইয়াছিল, সেই যন্ত্রণায় আকুল হইয়াই তিনি বার বার আমায় ডাকিয়াছিলেন, তাহা স্বপ্নে শুনিয়াছিলাম, সে কাতরকণ্ঠে আমার প্রাণে যে দাগ কাটিয়া দিয়াছে, তাহা আর এ জন্মে ভুলিতে পারিব না। বাবাকে যখন এ স্বপ্নের কথা বলিয়াছিলাম তখন তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন—স্বপ্ন না কি কখনও সত্য হয়, তিনি

এই বলিয়া বুঝাইয়াছিলেন। কিন্তু আমার পোড়া ভাগ্যে স্বপ্নই সত্য হইল। দিদি, তখনও তিনি নিশ্চয় পরলোক হ'তে আমাকে তেমনি কাতরভাবে ডাকিতেছেন, সেই আকুল আহ্বান যেন আমার কানে সারাদিন বাজিয়া রহিয়াছে, বাজিতে থাকে, তবে আমি সংসারে পড়িয়া থাকি কেন? ওগো তোমরা আশীর্ব্বাদ কর—যেন আমি শীঘ্র শীঘ্র মরিতে পারি, মরিয়া তিনি যেখানে আছেন সেই খানে গিয়া—যাহা এ জীবনে করিতে পাইলাম না—তাহা করিতে পাই, যেন সেখানে তাঁহার পদসেবার অধিকারিণী হই—যেন জন্মজন্মান্তরে সেই অধিকার আমার বজায় থাকে। তোমরা তাঁহার দেহের সংকার করিয়াছ, কিন্তু আমি বুঝিতেছি, সে চিতা এখনও নিভে নাই; সে চিতা আমার হৃদয়-শ্মশানে এখনও জ্বলিতেছে, চিরকাল জ্বলিবে, যতদিন তাঁহার কাছে যাইতে না পারি, ততদিন কেহই উহাকে নিভাইতে পারিবে না। দিদি, সতীর আশীর্ব্বাদ কখনও নিষ্ফল হয় না—তুমি আশীর্ব্বাদ কর যেন অচিরে এ শ্মশানখানা জগতের বুক থেকে স'রে যায়, যেন আমি জন্ম জন্ম তোমার মতন সতী লক্ষ্মী হই, স্বামীর চরণসেবা করিতে পাই; এ জীবনে কোনও কর্ত্তব্যই করা হইল না, যেন জন্মান্তরে তাহা করিতে পারি। এ সংসার মোহের আগার; এত দুঃখেও আমি যখন সন্তানগুলির কাঁদ কাঁদ মুখ দেখি, তখনই আবার মনে হয় যে এরাই আবার বড় হবে; এরাই আমাকে সুখী করিবে, এদেরই জন্য এখনও আমি বুক বাঁধিয়াছি, নিভৃতে ভিন্ন চ'খের জল ফেলি না, মনের ক্লেশ মনেই চাপিয়া রাখিয়াছি। মহামায়ার কত ছলনা, কত কৌশল কে বুঝিবে? তাই বলিতেছি যে আশীর্ব্বাদ কর যেন এই মোহের পঙ্কে আবার না পড়িতে হয়, যেন শীঘ্রই আমার মোহ-শিকল কাটিয়া যায়। আর আমার সুখের প্রয়োজন নাই, আর আমার আশার ছলনায় কাজ কি? লোকে সান্ত্বনা দিতে

আসে, কিন্তু তাহারা জানে না, বোঝে না যে তাহাদের সান্ত্বনার কথাগুলাতে বিষ মাখান আছে, যাতে আমার হৃদয় শান্ত না হইয়া বরং আরও জ্বলিয়া উঠে। আমার স্বামী দুনিয়ার বাহিরে ছিলেন, আমিও দুনিয়ার বাহিরে যাইতে চাই, আমার আর সংসারে কাজ নাই। দিদি! আজ আমি সর্ব্বসুখে বঞ্চিত হইয়াও যেন কোনও দিন তোমার স্নেহসুখ হইতে বঞ্চিত না হই। ইতি

তোমার হতভাগিনী ছোট ভগিনী
"সুহাসিনী"

* * * * * *

ইন্দ্রনাথের কথা

আমার মুখে এই গল্প শুনিয়া আমার স্ত্রীর রমণীহৃদয় সহানুভূতি ও অনুকম্পায় ভরিয়া গেল। বোধ হয় সেই দিন হইতে তিনি চরিত্রগঠনহীন শিক্ষার কুফল বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন কারণ এই বিষয় লইয়া আর কখনও আমার সহিত তাঁহার মতের গরমিল হয় নাই।

সমাপ্ত

কবিবর মনোমোহন বসু-বিরচিত

সত্যনারায়ণ কথা

একাধারে সরল ব্রতকথা ও মনোহর কাব্য 'জয়দেব' প্রণেতা প্রসিদ্ধ নাটককার শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন,—

"বঙ্গের স্বনামধন্য স্বভাবকবি মহাত্মা ৺মনোমোহন বসু প্রণীত খণ্ডকাব্য 'সত্যনারায়ণ' পাঠ করিয়া অতীত স্মৃতি পুনরুদ্দীপিত হইল। যাঁহার রচনার ভাব-বৈচিত্র্য ও শব্দমাধুর্য্যে প্রাণে নিতুই নবরসের বন্যা প্লাবিত করিয়া দিত, আজ তাঁহার নূতন মুদ্রিত সত্যনারায়ণ পাঠ করিয়া বার্দ্ধক্যের জীর্ণ দেহে নব বল সঞ্চার করিয়া দিল! মনে হয় যেন এ রস পানে আরও দিনকতক বাঁচিতে পারিব। কে না জানে—তাঁহার রচনা চিরদিনই সঞ্জীবনী-সুধা! মনোমোহন-সত্যনারায়ণ সেই সুধারই ভেয়ান। ইহাতে নাই কি? একাধারে কাব্য, নাটক, সাহিত্য, ভূগোল, ইতিবৃত্ত, শাস্ত্রবিধি ও উপন্যাস—সবই আছে। অনেক দিনের পর খাঁটীভাষায় সাজসজ্জাবিহীনা খাঁটী কবিতারাণী দেখিয়া আমার মত অনেকেই আনন্দলাভ করিবেন। প্রকাশকের জয়জয়কার হউক"।